ব্রাত্য বসুর নাটকে রাজনীতি অনুষঙ্গ

এম.ফিল (বাংলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্র

গবেষকঃ দেবব্রত জানা

রেজিস্ট্রেশন সংখ্যাঃ 142355 of 2017-2018

ক্রমিক সংখ্যাঃ 001700103015

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যাঃ MPBE194014

তত্ত্বাবধায়কঃ অধ্যাপক অনন্যা বড়ুয়া

শিক্ষাবর্ষঃ 2017-2019

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা

ভূমিকা ১-৫

প্রথম অধ্যায়ঃ নাট্যকার ব্রাত্য বসুর জীবন ও সাহিত্য,মতাদর্শ ৬-১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ১৯৯৮-২০০২ পর্বের রাজনৈতিক নাটক ১৮-৩০

'অরণ্যদেব'(১৯৯৮),'শহর ইয়ার'(২০০১),

'চতুষ্কোণ'(২০০১), 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'(২০০২)

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ২০০৩-২০০৭ পর্বের রাজনৈতিক নাটক ৩১-৪০

'ভাইরাস এম'(২০০৩), '১৭ই জুলাই'(২০০৪),

'কৃষ্ণগহ্বর'(২০০৭), 'ভয়'(২০০৭)।

উপসংহার ৪১-৪৪

গ্রন্থপঞ্জি ৪৫-৪৬

ভুমিকা

যে কোনো শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণার মূলে থাকে কোনো না কোনো ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপট। নাট্যশিল্পের ক্ষেত্রে এ কথাটি অধিক প্রাসঙ্গিক তাই নাটক সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে জন্মলগ্ন থেকে। নাটক যেহেতু সামাজিক ব্যক্তিমানুষের ভাবনা-চিন্তার শিল্পিত ফসল, সেহেতু প্রবহমান দেশকালের পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় নাট্যকারের চিন্তাধারা ও সামাজিক মূল্যবোধ বিশেষ বিশেষ সামাজিক বিষয়কে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়। সেভাবে নাট্যকারের শিল্পীসত্তা কোনো বিশেষ সময়ের সামাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা-সংকট, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, মজুর, ব্রাত্যদের দুঃখ-দারিদ্র্য, শোষন-বঞ্চনা, নিপীড়ন-নির্যাতন এবং তাঁদের বাঁচার দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রাম রূপায়িত করতে চায়। আধুনিক বাংলা নাটকে প্রতিবাদী চেতনা যেমন মূর্ত হয়ে উঠেছে, তেমনি সরাসরি এসেছে রাজনীতি প্রসঙ্গ।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের ভাবনা পাল্টে যেতে থাকল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার চেতনায় ফরাসি বিপ্লব, ইউরোপের শিল্প বিপ্লব ও ইউরোপীয় নবজাগরণ উনিশ শতকের বাঙালী চিন্তা ধারাকে নতুন ভাবে জাগ্রত করেছিল। যা মধ্যযুগীয় মানসিকতা ত্যাগ করে বাঙালী জীবনের সব রকমের কু-সংস্কার ও অন্ধকারময়তা থেকে ব্যক্তি সত্তাকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। মানুষের মনের মধ্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধের উন্মেষ ঘটল। মানুষ তুচ্ছ, ক্ষুদ্র নয়, এই বোধ শিক্ষিত সচেতন মানুষের মনে দৃঢ় হল। পরবর্তী সময়ে মার্কসবাদ মানুষের চিন্তা-চেতনার জগৎকে আরো বেশি পাল্টে দিল। শিল্প সাহিত্যে স্বাভাবিক ভাবে এর প্রভাব পড়ল। সামাজিক অবস্থান, অর্থনৈতিক সংকট, জীবনচর্যার টানাপোড়নের তথা মূল্যবোধের

সংঘাতের সূত্রে রাজনৈতিক বিশ্বাস ও তার রূপায়নের ঘাত-প্রতিঘাত জায়গা করে নিল নাটকে।

নাটক বা শিল্প সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রাজনীতি-শিক্ষার কতকগুলি নির্দিষ্ট দিক বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পায়। এগুলি হল

১. একটি দেশের নিজস্ব রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

২. রাজনীতি-অর্থনীতির আন্তর্জাতিক সমস্যা।

৩. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক।

৪. সভ্যতা ও শ্রেনিসংগ্রামের ইতিহাস, শ্রেণিবিন্যাস, সভ্যতার অগ্রগতি সমন্ধে শিক্ষা।

৫. রাজনৈতিক সংগ্রাম বা আন্দোলনের সময়,পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষা।

মূলত রাজনৈতিক নাটকগুলি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়।

বাংলা নাট্যরচনার পরম্পরাটি লক্ষ্য করলে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, উদ্ভব বা বিকাশের প্রথম যুগে প্রতিবাদী চেতনা বা বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শে তেমন কোনো নাটক লেখা হয়নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নকশা জাতীয় নাটিকা লেখা হয়েছে, যেখানে সামাজিক ক্ষতের তীব্রতা সহজ হয়ে গেছে স্থূল কৌতুক রসের আধ্যিকের কারণে। প্রকৃত পক্ষে দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পন’। বাংলা নাট্য সাহিত্যে প্রথম শোষিত-বঞ্চিত মানুষের নাটক। উনিশ শতকের গ্রামীণ অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক জীবনের এক প্রত্যক্ষ দলিল। ব্যক্তির বেদনা নয়, সমষ্টির যন্ত্রণা এই প্রথম দেখা গেল বাংলা নাটকে। এর পর নানান প্রতিবাদী চেতনা রাজনৈতিক দিক বাংলা নাটকে

প্রকাশ পেয়েছে। বিজন ভট্টাচার্য, তৃপ্তি মিত্র, ঋত্বিক ঘটক, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি গণনাট্য আন্দোলন কর্মীদের হাত ধরে বাংলা নাটকে নতুন দিকের সূচনা হল।

আমাদের দেশ তথা ভারতবর্ষের সংগ্রামী বিষয়ে নানা নাটক রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী', দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর 'মেবার পতন' ইত্যাদি নাটকগুলিতে ভারতবর্ষের পরাধীনতার রাজনৈতিক দিক যত ফুটে উঠেছে অর্থনৈতিক দিক তেমন স্পষ্ট নয়। কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকে তা অর্থনীতি দিক ভালোভাবে বুঝতে পারা যায়। আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে নবীনতম নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন ব্রাত্য বসু। রাজনৈতিক মতাদর্শের পাশাপাশি নাটক রচনায় ও অভিনয়ে ব্রাত্য বসুর হাত যে সিদ্ধহস্ত তা নাটকগুলি তাঁর পরিচয় প্রদান করে। রাজনৈতিক ফ্যান্টাসি, প্রকৃতি মানুষের সম্পর্ক, সংগীত ও জীবনের বন্ধন, মূল্যবোধহীনতা, বিপ্লব আর প্রেমের দ্বন্দ্ব, সময় ও সভ্যতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে রচিত ব্রাত্য বসুর একের পর এক নাটক যেমন মঞ্চ সাফল্য পেয়েছে, তেমনই গভীর ভাবে দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছে মানুষের মনে। মানুষের জীবনে আকণ্ঠ যন্ত্রণা ও আনন্দ, আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কার, প্রয়োজনের আঘাতে প্রায়শই প্রতিহত হয়। মানুষ বা সমাজের নানান সমস্যার পটভূমিকা নাটক গুলিতে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ব্রাত্য বসুর যে সব নাটক গুলিতে লক্ষ্য করা যায়,সে গুলিকে সময় পর্ব অনুযায়ী ভাগ করলে এইরূপ হয় যে-

ক)১৯৯৮ থেকে ২০০২ - 'অরণ্যদেব', 'শহর ইয়ার', 'চতুষ্কোণ', 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'।

খ)২০০৩ থেকে ২০০৭ - 'ভাইরাস এম', '১৭ ই জুলাই', 'কৃষ্ণগহ্বর', 'ভয়'।

১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে রচিত ব্রাত্য বসুর রাজনৈতিক নাটকগুলি হল ‘অরণ্যদেব’(১৯৯৮), ‘শহর ইয়ার’(২০০১), ‘চতুষ্কোণ’(২০০১), ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’(২০০২)। ‘অরণ্যদেব’ নাটকটি একটি রাজনৈতিক ফ্যান্টাসি। বিংশ শতকের শেষের দশকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা জানতে পারা যায় ‘অরণ্যদেব’ নাটকে। ২০০১ সালে ব্রাত্য বসুর লেখা দুটি রাজনৈতিক নাটক হল ‘শহর ইয়ার’ ও ‘চতুষ্কোণ’। ‘শহর ইয়ার’ নাটকটিতে শহর কলকাতার ভালোবাসার, বেদনার, স্মৃতির, অভিমানের, প্রতারনার রাজনৈতিক রূপ ফুটে উঠেছে। ‘চতুষ্কোণ’ নাটকটিতে রাষ্ট্রের রাজনীতি না থাকলেও মানুষে মানুষে সম্পর্কের রাজনীতি বিদ্যমান হয়ে রয়েছে। তীব্র রাজনৈতিক বক্তব্য ব্রাত্য বসুর যে নাটকে সবথেকে বেশি ফুটে উঠেছিল তা হল ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ নাটক। বিংশ শতকের সত্তর এর দশকের ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রনা, অবক্ষয়িত সমাজ বদলের রীতি ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ নাটকের মূল বিষয়।

২০০৩ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে নাট্যকার ব্রাত্য বসু যে রাজনৈতিক নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি হল ‘ভাইরাস এম’(২০০৩), ‘১৭ই জুলাই’(২০০৪), ‘কৃষ্ণগহ্বর’(২০০৭), ‘ভয়’(২০০৭)। ‘ভাইরাস এম’ নাটকটিতে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অনুভূতির দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। ‘১৭ই জুলাই’ নাটকটি ব্রাত্য বসু ২০০৪ সালে রচনা করেন। ‘১৭ই জুলাই’ নাটকটিতে উঠে এসেছে এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ২০০৩ সালে জুলাই মাসে গুজরাটের ‘পাঁচমহল’ জেলার অন্তর্গত ‘এরল’ গ্রামের একটি ঘটনা নিয়ে ‘১৭ই জুলাই’ নাটকের আখ্যান রচিত হয়। আসিফ মির্জা ও আরও কয়েকজন মুসলিম ছেলেকে জড়ানো হয় একটি মিথ্যা ধর্ষণ মামলায়, এই মামলার সূত্রে পরস্পর মুখোমুখি হয় রাজনৈতিক আইন ব্যবসায়ী পঙ্কজ পারেখ ও সতত সংগ্রামী লড়াকু আইনজীবি রাকেশ চ্যাটার্জী। মামলা চলাকালীন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ভারতবর্ষের রাজনীতি ধর্ম ও আরও নানান অবস্থার প্রকৃত চালচিত্র। আসিফরা বাঁচতে

পারবে কিনা এই নিয়ে পাঠকের মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়। নাট্যকার ব্রাত্য বসু '১৭ই জুলাই' নাটকে পাঠকের জিজ্ঞাসু মনের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।

'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকটি ব্রাত্য বসু ২০০৭ সালে জুলাই মাসে রচনা করেন। এই নাটকে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ছাপ কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকটিতে সমকামিতার জীবনের রাজনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে এক অস্থিরতা বোধ কাজ করে। ২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাত্য বসু 'ভয়' নাটকের খসড়া তৈরি করেন। আবার সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় 'ভয়' নাটকটি লেখেন 'পূর্ব পশ্চিম' নাট্যপত্রের জন্য। 'ভয়' নাটকটি মূলত ভূতের নাটক হলেও, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি উত্থান পতনের অবস্থা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

নাট্যকার ব্রাত্য বসুর বেশিরভাগ নাটকগুলিতে দেখা মিলেছে এক সমাজ নির্ভর বাস্তব চিত্র। রাজনীতি, অবক্ষয়ী সমাজ, ব্যক্তি অর্থাৎ সমগ্র জীবনের টুকরো টুকরো প্রতিফলনের অবিমিশ্র ছবি থাকে ব্রাত্য বসুর নাটকে। নাট্যচেতন বিকাশ ও নাট্যধারার মধ্যে বিবর্তনের রূপের যে এক স্পষ্ট রূপ পাওয়া গিয়েছে দীর্ঘ সময় পর তা নাট্যপ্রেমিদের মধ্যে নতুন ভাবনার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এক পুরনো যুগের চলন চিত্রের রূপের যে পরিবর্তন ব্রাত্য বসুর কলমে নতুন রূপে ভিন্ন দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে। আমার আলোচনার প্রয়াস হল, ব্রাত্য বসুর নাটকে দলগত রাজনীতি, না ব্যক্তিগত সম্পর্কের রাজনীতি আছে তা খোঁজ করা।

প্রথম অধ্যায়

নাট্যকার ব্রাত্য বসুর জীবন ও সাহিত্য, মতাদর্শ

বাংলা নাট্যজগতে নবীনতম নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু। আধুনিক নাট্যকার ব্রাত্য বসুর জন্ম ১৯৬৯ সালে মেদিনীপুরে। ব্রাত্য বসুর পিতা হলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিষ্ণু বসু, মাতা নীতিকা বসু, স্ত্রী পৌলমী বসু, ব্রাত্য বসুর পূর্ব নাম ব্রাত্যব্রত বসুরায় চৌধুরি। বর্তমানে বাংলা দেশের ফরিদপুর অর্থাৎ পূর্বতন 'উলপুর' এর বসুরায় চৌধুরি পরিবার থেকে কলকাতায় এসেছিলেন তাঁদের বসু পরিবার।

১৯৭২ সালে ব্রাত্য বসুর পিতা বিষ্ণু বসু মেদিনীপুর কলেজে ইস্তফা দিয়ে, মেদিনীপুর থেকে দমদম পার্কে চলে আসেন। ১৯৭৩ সালে বিষ্ণু বসু বাঙ্গুরে বাড়ি ভাড়া করেন এবং হাওড়ার 'লাল বাবা কলেজে' যোগদান করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন। ফলে রাজনৈতিক প্রভাব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠে বিষ্ণু বসুর জীবনে। ব্রাত্য বসুর মধ্যেও সেই পারিবারিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছিলেন।

বাঙ্গুর স্কুলে ব্রাত্য বসুর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯৮৫ সালে স্কটিশচার্চ কলেজে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়াশুনার জন্য ভর্তি হন। ব্রাত্য বসু আঠারো থেকে উনিশ বছর বয়সে দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলা অনার্সে প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। ১৯৮৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'ড্রামা সোসাইটি' প্রযোজনায় ব্রাত্য বসুর নির্দেশে প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় 'আরেকটি কলকাতা' নামে। ১৯৯০সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেন। তিন বছর পর সিটি কলেজে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন ব্রাত্য বসু। এই সময় ব্রাত্য বসুর পিতা বিষ্ণু বসু রোজিলান্ড রোজ এর 'টুয়েলভ অ্যাংগ্রি ম্যান' অবলম্বনে লেখা

‘মান্যবর ভুল করছেন’ নাটকের রচনা করেন। ১৯৯০ সালে ব্রাত্য বসু ‘গণকৃষ্টি’ নাট্যদলে সাউণ্ড অপারেটর পদে যোগদান করেন এবং ১৯৯১ সালে ‘মান্য বর ভুল করছেন’ নাটকটিতে অভিনয় করেন।

নাট্যকার ব্রাত্য বসুর মধ্যে কবিতা লেখার আগ্রহ ছিল কিন্তু নাটক লেখার প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না। ১৯৯৪ সালে ব্রাত্য বসু পিটার শ্যাফারের ‘ফাইভ ফিংগার এক্সারসাইজ’ নাটকের কাহিনী অবলম্বনে ‘ওরা পাঁচজন’ নাটক রচনা করেন। ‘ওরা পাঁচজন’ নাটকটি রাচনার দায়িত্ব ‘গণকৃষ্টি’ নাট্যদলের অন্য একজনের উপর ছিল। কিন্তু তিনি ‘ওরা পাঁচজন’ নাটকটি রচনায় অসফল হলেন। ব্রাত্য বসু ‘ওরা পাঁচজন’ নাটকের রচনার দায়িত্ব নিলেন ও সফল হলেন।

১৯৯৪ সালে ব্রাত্য বসু জীবনের প্রথম মৌলিক নাটক রচনা করলেন ‘অশালীন’। চারটি দৃশ্য নির্ভর ‘অশালীন’ নাটকের বিষয় বৈচিত্র্যে সামাজিক প্রেমময়তা সুজন ও রীনার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ‘অশালীন’ নাটকের চরিত্ররা অনেক সময় অশালীন বাক্যবন্ধ ব্যবহার করে হাস্যরস সৃষ্টি করলেও, হাস্যরসের মধ্যে কোথাও ভাঁড়ামি নেই। ভাষার মধ্য দিয়ে সত্য সব সময় প্রকাশ পায় না বলে, পল সাইমনের ‘সাউণ্ড অব সাইলেন্স’ গান ‘অশালীন’ নাটকে বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে ২৯শে সেপ্টেম্বর ‘গণকৃষ্টি’ নাট্যদলের সহায়তায় কলকাতা ‘আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস’ এ ‘অশালীন’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

১৯৯৮ সালে নাট্যকার ব্রাত্যবসু জীবনের দ্বিতীয় নাটক রচনা করলেন ‘অরণ্যদেব’। ‘অরণ্যদেব’ একটি রাজনৈতিক ফ্যান্টাসিধর্মী নাটক। সমাজের বাস্তব চিত্রকে ব্রাত্য বসু তাঁর ‘অরণ্যদেব’ নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। ‘অরণ্যদেব’ নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ৭ই আগস্ট ১৯৯৮ সালে ‘গণকৃষ্টি’ নাট্যদলের সহায়তায় ‘আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস’ এ কলকাতায়। ‘অরণ্যদেব’ চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন ব্রাত্য বসু। এই বছর ব্রাত্য বসু ‘মুখোমুখি

বসিবার' নাটকটি রচনা করেন। এই সময় ব্রাত্য বসুর জীবনে এক নতুন পালক যুক্ত হল, তিনি 'শ্যামল সেন স্মৃতি সম্মান' লাভ করেন।

১৯৯৯ সালে ভারত এক কঠিন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ছিল। কার্গিল যুদ্ধ, একের পর এক ধর্মীয় দাঙ্গা, গুজরাট দাঙ্গা, এ ছাড়াও মাওবাদীদের প্রভাব বেশ লক্ষ্য করার মত ছিল। এই রূপ পরিস্থিতিতে ব্রাত্য বসুর নাটক লেখার গতি তীরের ফলার মতো এগিয়ে চলল। ২০০১ সালে ব্রাত্য বসু দুটি নাটক রচনা করলেন 'শহর ইয়ার' ও 'চতুষ্কোণ'। নাটক দুটিতে সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ২০০১ সালের ২৩ শে জুলাই 'চতুষ্কোণ' ও ২১ শে অক্টোবর 'শহর ইয়ার' নাটক দুটির অভিনয় হয় 'গণকৃষ্টি' নাট্যদলের সহায়তায় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস' এ।

২০০১ সালে ব্রাত্য বসু প্রথম বারের জন্য 'সত্যেন মিত্র পুরষ্কার' লাভ করেন। এই বছর ব্রাত্য বসু কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের অনুদান কমিটির একজন সদস্য হয়েছিলেন।

২০০২ সালে ব্রাত্য বসু সর্বাধিক বিতর্কিত রাজনৈতিকধর্মী নাটক 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' রচনা করলেন। 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকটির রচনাকাল ২০০২ হলেও, নাটকটির সময়কাল ২০০১ সাল। ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সমাজকে যেভাবে জটিল করে তুলেছিল, ব্রাত্য বসু তাঁরকলমের অসমসাহসী শক্তির ফলে 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকে সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করলেন। ২০০২ সালে ১৭ ই জুলাই 'সংসৃতি' নাট্যদলের সহায়তায় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস' এ 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটক রচনার ফলে ব্রাত্য বসুর নাট্যপ্রেমীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকল। 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটক নিয়ে প্রায় সমস্ত নাট্য ব্যক্তিত্ব সমালোচনা করলেন। কারও কাছে প্রশংসা পেল। আবার কারও কাছে সমালোচিত হল।

‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ নাটক রচনার পরের বছর ‘ভাইরাস এম’ নাটক রচনা করলেন ব্রাত্য বসু। একটি অবক্ষয়ী মনুষত্ত্বের সংকটময়ী নাটক হল ‘ভাইরাস এম’। ২০০৩ সালের ২৩শে জুলাই ‘গণকৃষ্টি’ নাট্যদলের সহায়তায় কলকাতার ‘আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস’এ ‘ভাইরাস এম’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ২০০৩ সালে ব্রাত্য বসুর জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল ‘রাস্তা’ চলচ্চিত্রটি পরিচালনার মধ্য দিয়ে। এই বছর ব্রাত্য বসু দ্বিতীয় বারের জন্য ‘সত্যেন মিত্র পুরস্কার’ লাভ করেন।

২০০৩ সালের জুলাই মাসে গুজরাটের ‘পাঁচমহল’ জেলার অর্ন্তগত ‘এরল’ গ্রামের একটি ঘটনা নিয়ে, ২০০৪ সালে ব্রাত্য বসু ‘১৭ই জুলাই’ নামে একটি উগ্ররাজ়নৈতিক নাটক রচনা করলেন। উৎপল দত্তের ‘মানুষের অধিকার’ নাটক অবলম্বনে ব্রাত্য বসু ‘১৭ই জুলাই’ নাটকটি রচনা করলেন। আসিফ মির্জা ও আরও কয়েকজন মুসলিম ছেলেকে জড়ানো হয় একটি মিথ্যা ধর্ষণ মামলায়, এই মামলার সূত্রে পরস্পর মুখোমুখি হয় রাজনৈতিক আইন ব্যবসায়ী পঙ্কজ পারেখ ও সতত সংগ্রামী লড়াকু আইনজীবি রাকেশ চ্যাটার্জী। মামলা চলাকালীন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ভারতবর্ষের রাজনীতি ধর্ম ও আরও নানান অবস্থার প্রকৃত চালচিত্র। আসিফরা বাঁচতে পারবে কিনা এই নিয়ে পাঠকের মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়। নাট্যকার ব্রাত্য বসু ‘১৭ই জুলাই’ নাটকে পাঠকের জিজ্ঞাসু মনের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।

২০০৪ সালে নভেম্বর মাসে ‘আনন্দ পাবলিশার্স থেকে ব্রাত্য বসুর লেখা ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশ পায় ২০১৭ সালের আগস্ট মাসে। ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থটি ব্রাত্য বসু উৎসর্গ করেন মা নীতিকা বসু, পিতা বিষ্ণু বসু, স্ত্রী পৌলমী বসু এবং ব্রাত্য বসুর সমস্ত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, শুভানুধ্যায়ী ও ভালোবাসার লোকজনদের। ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মোট নয়টি নাটক স্থান পেয়েছে। এগুলি হল

‘অশালীন’, ‘অরন্যদেব’, ‘মুখোমুখি বসিবার’, ‘চতুষ্কোণ’, ‘শহর ইয়ার’, ‘ভাইরাস এম’, ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’, ‘মৃত্যু ঈশ্বর যৌনতা’, ‘বাবলি’।

২০০৫ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাত্য বসু ‘পেজ ফোর ইটস অলসো এ গেম’নাটকের রচনা করেন। এই নাটকটি ব্রাত্য বসু উৎসর্গ করেন ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়, রুমকি চট্টোপাধ্যায় এবং ‘লোককৃষ্টি’ নাট্যদলের সমস্ত সদস্যদের। ‘পেজ ফোর ইটস অলসো এ গেম’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয় ২০০৫ সালে ‘লোককৃষ্টি’ নাট্যদলের সহায়তায়। এই বছর ‘কথাকৃতি নাট্যপত্রে’ ব্রাত্য বসুর লেখা ‘কালান্তক লালফিতা’ নাটকটি প্রথম প্রাকাশ পায়। এ ছাড়াও ‘অপারেশন ২০১০’, ‘মে দিবসের লাটক’, ‘বিসর্জনের পর,’ ইত্যাদি নাটকগুলি প্রকাশ পায়।

২০০৬ সালে ব্রাত্য বসু ‘গণকৃষ্টি’ নাট্যদল ত্যাগ করে নিজে একটি নতুন নাট্যদল গঠন করলেন ‘স্বপ্নসন্ধানী’ নাট্যদল নামে। ‘স্বপ্নসন্ধানী’ নাট্যদলের প্রযোজনায় ‘হেমলাটঃদ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা’ নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়। শেক্সপীয়রের ‘হ্যামলেট’ নাটকের আদলে ব্রাত্য বসু ‘হেমলাটঃদ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা’ নাটকটি রচনা করেন। ২০০৬ সালে ‘দেবীতর্জন’ ও ‘সময়যান’ নাটক দুটির প্রথম প্রকাশ হয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। এই সময় সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘হারবার্ট’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন ব্রাত্য বসু।

২০০৭ সালে ‘ব্রাত্যজন নাট্যপত্রের’ প্রথম প্রকাশ হয় ব্রাত্য বসুর সম্পাদনায়। ‘ব্রাত্যজন নাট্যপত্র’ নাট্যজগতে এক বিশেষ সাড়া ফেলেছিল। ২০০৭ সালে ২১-২৪ শে জুলাই ব্রাত্য বসু ‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকটি রচনা করেন। ‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকটি তন্দ্রা চট্টোপাধ্যায় ও সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন। ২০০৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ‘নিভা আর্টস’ ও ‘লোককৃষ্টি’ নাট্যদলের প্রযোজনায়, ব্রাত্য বসুর পরিচালনায় তপন থিয়েটারে ‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকটি প্রথম অভিনয় হয়। ২০০৭ সালে ব্রাত্য বসুর লেখা ‘হেমলাট দ্য প্রিন্স অফ গরানহাটা’ নাটকের প্রথম

প্রকাশ হয় ‘পত্রলেখাতে’। এই নাটকটি ব্রাত্য বসু উৎসর্গ করেন প্রসূন ভট্টাচার্য ও সত্রাজিত সরকার কে।

২০১০ সালে ব্রাত্য বসুর পিতা বিষ্ণু বসুর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ‘বিষ্ণু বসু স্মৃতি সম্মান’ এর সূচনা করেন ব্রাত্য বসু। ২০০৮ সালে ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত ‘কমরেড কথা’ নাটকটির প্রথম প্রকাশ হয় ‘অনুষ্টুপ’ পত্রে। ২০০৯ সালে ব্রাত্য বসু দেবব্রত বিশ্বাসের জীবনী নিয়ে রচনা করলেন ‘রুদ্বসংগীত’ নাটক। ২০০৯ সালে শারদীয়া ‘প্রতিদিন’ পত্রিকাতে ‘রুদ্বসংগীত’নাটকের প্রথম প্রকাশ হয়। এই বছর ১৯ শে মার্চ ‘ব্রাত্যজন’ নাট্যদলের প্রযোজনায়,ব্রাত্য বসুর পরিচালনায় ‘রুদ্বসংগীত’ নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় কলকাতার ‘আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস’ এ। কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতার অনুপ্রেরণায় ব্রাত্য বসু ‘বাবরের প্রার্থনা’নাটকটি রচনা করেন। ২০০৯ সালের ২৪ শে মে ‘লালমাটি’ পত্রিকাতে ‘বাবরের প্রার্থনা’ নাটকটি প্রকাশিত হয়। ‘বাবরের প্রার্থনা’ নাটকটি ব্রাত্য বসু উৎসর্গ করেন শিলাদিত্য গঙ্গোপাধ্যায় ও বুলবুল গঙ্গোপাধ্যায়কে। ‘কল্যানী’ নাট্যচর্চা কেন্দ্রের প্রযোজনায়, কিশোর সেনগুপ্তের পরিচালনায় ২০০৭ সালে ৫ ই এপ্রিল কলকাতার ‘আকাদেমিতে’ ‘বাবরের প্রার্থনা’ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ২০০৯ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ব্রাত্য বসুর লেখা ‘অরকুটে যুক্ত হল বাল্টিমোর আর নদিয়া’ নাটকটির প্রথম প্রকাশ হয় ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’। এই সময় ব্রাত্য বসুর লেখা ‘ভয়’ নাটকটি ‘লালমাটি’ প্রকাশনায় প্রথম প্রকাশ হয়। ব্রাত্য বসু ‘ভয়’ নাটকটি উৎসর্গ করেন প্রীতিময় চক্রবর্তী ও সোম চক্রবর্তীকে। ‘ভয়’ নাটকটি ভূতের নাটক হিসেবে গ্রহনযোগ্য হলেও সমসাময়িক পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এ নাটকের প্রধান বিষয়।

২০১০ সালে ব্রাত্য বসুর ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ‘আনন্দ পাবলিশার্স’ থেকে। ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় মূদ্রণ প্রকাশিত হয় ২০১৭ সালের জুলাই

মাসে । ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি ব্রাত্য বসু উৎসর্গ করেন ব্রাত্যজন নাট্যদলের সমস্ত সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের।

‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের তুলনায় দ্বিতীয় খণ্ডের নাটকগুলি আরও তীব্র ও আরও বিস্ফোরক। ২০০৪-২০০৫ সাল থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে মোট নয়টি ছোট নাটক ও আটটি বড় নাটক স্থান পেয়েছে। বড় নাটকগুলি হল ‘পেজ ফোর ইটস অলসো এ গেম’, ‘দর্জিপাড়ার মর্জিনারা’, ‘হেমলাটঃ দ্য প্রিন্স অফ গরাণহাটা’, ‘বাবরের প্রার্থনা’, ‘কৃষ্ণগহ্বর’, ‘ভয়’, ‘বিকেলে ভোরের সর্ষে ফুল’, ‘রুদ্ধসংগীত’। ছোট নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘কালান্তক লালফিতা’, ‘অপারেশন ২০১০’, ‘মে দিবসের লাটক’, ‘বিসর্জনের পর’, ‘দেবীতর্জন’, ‘সময়জান’, ‘অরকুটে যুক্ত হল বালিটমোর আর নদিয়া’, ‘কমরেড কথা’, ‘খঞ্জনা আমি আর আসব না’, ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ছোট বড় নাটক মিলিয়ে মোট সতোরোটি নাটক নাট্যজগতে বেশ সাড়া ফেলেছে। ২০১০সালে ব্রাত্য বসু ‘তারা’ চলচ্চিত্র পরিচলনা ও অভিনয় করেন। ২০১১ সালে ব্রাত্য বসু ‘হ্যালো মেমসাহেব’ ও ‘ইচ্ছে’ চলচ্চিত্র দুটির অভিনয় করেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালনায়। ২০১১ সালে ব্রাত্য বসুর লেখা ‘সুপারি কিলার’ নাটকটি প্রথম প্রকাশ হয় কলকাতা বইমেলাতে। ‘সুপারি কিলার’ নাটকটি ব্রাত্য বসু উৎসর্গ করেন রবিশঙ্কর বলকে। ২০১১ সালের ১৯শে মে ‘প্রাচ্য থিয়েটার’ দলের প্রযোজনায়, বিপ্লব বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ‘সুপারি কিলার’ নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ‘আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস’ এ।

শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প অবলম্বনে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘ব্যোমকেশ’ নাটকের নির্দেশনা করেন ব্রাত্য বসু। বিজয় তেন্ডুলকর রচিত ‘কন্যাদান’ নাটক, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প অবলম্বনে শেখর সমাদ্দার রচিত ‘ক্যানভাসার’ নাটকের পরিচালনা

করেন ব্রাত্য বসু 'ব্রাত্যজন' নাট্যদল প্রযোজনায়। ২০১৩ সালে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায় পরিচালিত 'মুক্তধারা' চলচ্চিত্রে ব্রাত্য বসু অভিনয় করেন। এছাড়া 'মহাপুরুষ' ও 'কালপুরুষ', সৃজিত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'হেমলক সোসাইটি', অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত 'তিন কন্যা', পার্থ সেন পরিচালিত 'বালুকাবেলা ডট কম' প্রভৃতি চলচ্চিত্রে ব্রাত্য বসু অভিনয় করেন।

ব্রাত্য বসুর পরিচালনায় ২০১২ সালে 'প্রথম আন্তর্জাতিক ব্রাত্যজন নাট্য উৎসব আয়োজন হয় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'এ। ১৬ই ফ্রেব্রুয়ারী থেকে ১৯শে ফ্রেব্রুয়ারী মোট চারদিন ধরে নাট্য উৎসব চলেছিল। অসম, বাংলাদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতি জায়গার নাট্যদল যোগদান করেছিল এই নাট্য উৎসবে। ২০১৩ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে ২৪শে এপ্রিল 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ব্রাত্যজন নাট্য উৎসব'আয়োজন হয় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'এ। নেপাল, ইতালি ছাড়াও ইম্ফল, কাঠমাণ্ডু, কেরালা থেকে নাট্যদল এসেছিল নাট্য উৎসবে যোগদানের জন্য। সাতদিনে মোট এগারোটি নাটক অভিনীত হয়েছিল। ব্রাত্য বসু ২০১৩ সালে 'আলতাফ গোমস' ও 'সিনেমার মতো' নাটক দুটির রচনা করেন।

২০১৩ সালে ২২শে মে 'ব্রাত্যজন' নাট্যদলের প্রযোজনায় 'সিনেমার মতো' নাটকের অভিনয় হয় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'এ। 'সংস্কৃতি' নাট্যদলের সহায়তায় 'আলতাফ গোমস' ও 'আপাতত এইভাবে দুজনের দেখা হয়ে থাকে' নাটক দুটির অভিনয় হয় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'এ। এই সময় ব্রাত্য বসু 'কে?' নাটকের রচনা করেন। ২০১৪ সালে ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ব্রাত্য বসুর নির্দেশনায় 'কালিন্দী ব্রাত্যজন' নাট্যদলের প্রযোজনায় 'কে?' নাটকের প্রথম অভিনয় হয় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'এ।

২০১৪ সালে ‘তৃতীয় আন্তর্জাতিক ব্রাত্যজন নাট্য উৎসব’ আয়োজন হয় কলকাতার ‘আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস’এ। ৫ই জুন থেকে ১১ই জুন সাতদিন ধরে নাট্য উৎসব চলেছিল। এই বছর ব্রাত্য বসু ‘দুটো দিন’ নাটকের রচনা করেন। ২০১৪ সালে ব্রাত্য বসু ‘এক এক্কে দুই’ ও ‘পারাপার’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই সময় ব্রাত্য বসুর লেখা ‘জতুগৃহ’ ও ‘আনন্দবাঈ’ নাটক দুটি প্রথম প্রকাশ হয় যথাক্রমে ‘জাগোবাংলা’ ও ‘সুখী গৃহকোণ’ পত্রিকায়। ব্রাত্য বসু মায়ের স্মৃতিকে স্মরণীয় রাখতে ‘নীতিকা বসু স্মারক বক্তৃতার সূচনা করেন ২২শে ডিসেম্বর ২০১৪ সালে।

২০১৫ সালে ‘আপাতত এইভাবে দুজনের দেখা হয়ে থাকে’, ‘দুটো দিন’, ‘কে?’ ব্রাত্য বসুর এই নাটকগুলি নিয়ে ‘এবার তিনটি নাটক’ নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ হয় ‘দীপ প্রকাশনার’ সহায়তায়। ব্রাত্য বসু ‘এবার তিনটি নাটক’ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ব্রাত্যজন নাট্যদলের দুই সহযাত্রী দেবাশিষ রায় ও শোভন গুপ্তকে। ২০১৫ সালে শেক্সপীয়রের নাটক ‘টুয়েলফথ নাইটস’ অবলম্বনে দেবাশিষ রায় রচিত ‘মুম্বাই নাইটস’ নাটকের পরিচলনা করেন ব্রাত্য বসু। এই সময় ‘ব্রাত্যজন’ নাট্যদল প্রযোজনা করলেন ‘বোমা’ নাটকের। ‘বোমা’ নাটকটি প্রথম প্রকাশ হয় ‘কারিগর’ প্রকাশনার সহায়তায় ২০১৬ সালের বইমেলাতে। ব্রাত্য বসু বোমা নাটকটি উৎসর্গ করেন সুবোধ সরকারকে। ২০১৫ সালের ৪ঠা জুন থেকে ১০ই জুন পর্যন্ত ‘চতুর্থ আন্তর্জাতিক ব্রাত্যজন নাট্য উৎসব’ আয়োজন হয় কলকাতার ‘আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস’এ।

২০১৬ সালে ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ‘আনন্দ পাবলিশার্স’ থেকে। বারোখানি নাটক সম্বলিত গ্রন্থটি ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতিম কবি ‘জয় গোস্বামী’কে উৎসর্গ করেন। ‘নাটক সমগ্র’ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকা লিখেছেন স্বপন

চক্রবর্তী। তৃতীয় খণ্ডের নাটকগুলি হল 'সুপারি কিলার,' 'সিনেমার মতো', 'আলতাফ গোমস,' 'আপাতত এইভাবে দুজনের দেখা হয়ে থাকে', 'দুটো দিন', 'কে?', 'জতুগৃহ', 'আনন্দীবাঈ', 'বোমা', 'ফোর্থবেল', 'ইলা-গুঁড়েষা', 'জীবজন্তু' প্রভৃতি।

নাটক বিনির্মিত হয় সময় আর জীবনের পারস্পরিক প্রতিবিম্বে। জীবনের আপাত জতুগৃহে মানুষরূপী জীবজন্তু আপাতত হয়তো দুটো দিনের দেখা সাক্ষাৎ পেয়ে যায় কোনো এক সুপারি কিলারের হদিশ। আনন্দীবাঈ এর প্রেম সিনেমার মতো জীবনের পাতায় হেঁটে চলেবেড়ায় আলতাফ গোমস। অর্থাৎ 'নাটক সমগ্র' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড জীবনের মুখোমুখি জীবন দাঁড়িয়ে একে অপরকে প্রশ্ন করে যায় জন্ম থেকে মৃত্যু সীমানা পর্যন্ত। এছাড়া 'নাটক সমগ্র' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লোকসংস্কৃতি, জনসংস্কৃতি এবং রাজসভার ভাষা এমনকি কাব্যনাট্যের ভাষাও বেশ লক্ষ্য করা যায়।

২০১৬ সালে 'দীপ প্রকাশনার' সহায়তায় 'এইবারে দুটি নাটক' নামে ব্রাত্য বসুর একটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়। 'এইবারে দুটি নাটক' গ্রন্থটিতে 'ফোর্থবেল' ও 'ইলা-গুঁড়েষা' নাটক দুটি স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন রাজর্ষি দে কে। ২০১৬ সালে 'পঞ্চম আন্তর্জাতিক ব্রাত্যজন নাট্য উৎসব' আয়োজন হয় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস'এ ৩১শে মে থেকে ৫ই মে পর্যন্ত। ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত বাংলা চলচিত্র 'মেঘে ঢাকা তারা' অবলম্বনে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকের নির্দেশনা করেন ব্রাত্য বসু। নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা অসীম চক্রবর্তীর জীবন-নির্ভর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'অদ্য শেষ রজনী' নাটকের নির্দশনা করেন ব্রাত্য বসু ২০১৬ সালে পাইকপাড়া 'ইন্দ্ররঙ্গ' নাট্যদলের প্রযোজনায়।

২০১৭ সালের পাইকপাড়া 'ইন্দ্ররঙ্গ' নাট্যদলের প্রযোজনায় 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষী' নাটকের রচনা ও নির্দেশনা করেন ব্রাত্য বসু। ইনরিতু পরিচালিত ইংরেজী চলচ্চিত্র '২১ গ্রামস্' অবলম্বনে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'একুশ গ্রাম' নাটকের নির্দেশনা করেন ব্রাত্য বসু নৈহাটি 'ব্রাত্যজনের' প্রযোজনায় ২০১৭ সালে। এই বছর 'ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক ব্রাত্যজন নাট্য উৎসব' আয়োজন হয় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস' এ ৩০ শে মে থেকে ৪ঠা জুন।

২০১৮ সালে ব্রাত্য বসু ২৬তম 'অ্যানুয়েল কালাকার' পুরস্কার লাভ করেন। 'বারান্দা' চলচ্চিত্রের জন্য 'স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন ব্রাত্য বসু। ব্রাত্য বসুর পরিচালনায় 'সপ্তম আন্তর্জাতিক ব্রাত্যজন নাট্য উৎসব' আয়োজন হয় কলকাতার 'আকাদেমি অফ ফাইন আর্টস' এ ২৯শে মে থেকে ৩রা জুন ২০১৮।

প্রত্যাখান, অপমান, অবহেলা সহ্য করেই ভালোবাসাকে মূলধন করে প্রাণপনে থিয়েটারকে যিনি আঁকড়ে ধরে থাকতে চান তিনি হলেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু।

নাটক চিরকাল সমাজ রাজনীতির দায় বহন করে চলে। ব্রাত্য বসুর নাটকে আমাদের চারপাশে বহে চলা ঘটনাবলীর একটা মূল্যায়ণ ঘটে। তাঁর নাটক আমাদের মন, আমাদের হাসি-কান্নার, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসার দর্পণ রূপে কাজ করে। ব্রাত্য বসুর নাট্যচিন্তা একটু ভিন্ন গোত্রের, কারণ অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যচর্চা তাঁর প্রিয় নেশা। কলেজ জীবন থেকে ব্রাত্য বসু নাট্যচর্চা শুরু করেছিলেন 'আরেকটি কলকাতা' নামক নাটক প্রযোজনার মধ্য দিয়ে। নাটক রচনা, অভিনয়, নির্দেশনা প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্রাত্য বসু এক অভিনব ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ব্রাত্য বসু সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনার দ্বন্দ্ব নিয়ে তাঁর নাটক গুলিকে বিন্যস্ত করেননি, বরং সমাজ দ্বন্দ্বের চেহারাকে কাটিয়ে তুলে শোষিত নিপীড়িত

মানুষের কাহিনীকে রূপ দিয়েছেন। কারণ তিনি মনে করেছেন সমাজে সাধারণ মানুষের মুক্তি মানে সমাজের অগ্রগতি হওয়া। নাট্যকারের প্রতিটি নাটক সাধারণ জনগণের প্রতি কোনো না কোনো নতুন বার্তা দিয়ে থাকে, নাট্যকার ব্রাত্য বসুর নাটক গুলিও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে সমকালীন সময়ের বিষয়কে নাট্যসাহিত্যে গ্রহণ করে বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবনার নাট্যরচনা ও প্রযোজনা করে ব্রাত্য বসু আধুনিক বাংলা নাট্যধারার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

রাজনৈতিক মতাদর্শ, ভাব, কল্পনা আধুনিক যুগের নাট্যকার ব্রাত্য বসুর নাটকের মধ্যে বেশ লক্ষ্য করা যায়, ব্রাত্য বসুর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটধর্মী নাটকগুলি হল ‘অরন্যদেব’, ‘শহর ইয়ার’, ‘চতুষ্কোণ’, ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’, ‘১৭ই জুলাই’, ‘কৃষ্ণগহ্বর’, ‘ভয়’, প্রভৃতি নাটকের কোনো না কোনো রাজনৈতিক দিক পরিস্ফুট হয়েছে। উৎপল দত্তের ‘১৭ই জুলাই’ নাটকের রিমেক রচনা করেন ব্রাত্য বসু। মার্কসবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্তের নাটকে শ্রেনীসংগ্রামের চিত্র বেশি করে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে নাট্যকার ব্রাত্য বসুর ‘১৭ই জুলাই’ নাটকেও শ্রেনীসংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে।

নাটক রচনা, নাটক নির্বাচন, নাটক সম্পাদন, আলো, শব্দ, মঞ্চসজ্জা, সংগীত প্রভৃতি দিক গুলিতে নাট্যকার ব্রাত্য বসু আধুনিক যুগের বাংলা নাট্যজগতে এক নতুন পথের প্রদর্শক রূপে কাজ করে চলেছেন। নাট্যঅভিনয় ও নাট্যরচনা ছাড়াও ব্রাত্য বসুর নাট্যদল সংগঠনের পরিচয়ও পাওয়া যায় .২০০৮ সালে ব্রাত্য বসু ‘ব্রাত্যজন’ নাট্যদল গঠন করেন। আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে সৃজনশীলতার অধিকারী, বস্তুবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী, নিখুঁত চরিত্র চিত্রনে এবং যার নাটক রচনার মধ্যে নাট্যশিল্প গুণ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় তিনি হলেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৯৮-২০০২ পর্বের রাজনৈতিক নাটক

ব্রাত্য বসুর বেশিরভাগ নাটকগুলিতে দেখা মিলেছে এক সমাজ নির্ভর বাস্তব চিত্র, রাজনীতি, অবক্ষয়ী সমাজ, ব্যক্তি অর্থাৎ সমগ্র জীবনের টুকরো টুকরো প্রতিফলনের ছবি থাকে ব্রাত্য বসুর নাটকে। ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে রচিত ব্রাত্য বসুর রাজনৈতিক ধর্মী নাটকগুলি হল 'অরণ্যদেব'(১৯৯৮), 'শহরইয়ার'(২০০১), 'চতুষ্কোণ'(২০০১), 'উইঙ্কল টুইঙ্কল'(২০০২)। 'অরণ্যদেব' একটি রাজনৈতিক কল্পনাধর্মী নাটক। বিংশ শতকের শেষের দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা জানতে পারা যায় 'অরণ্যদেব' নাটকে। ২০০১ সালে ব্রাত্য বসুর লেখা দুটি রাজনৈতিক নাটক হল 'শহর ইয়ার', ও 'চতুষ্কোণ'। 'শহর ইয়ার' নাটকটিতে শহর কলকাতার ভালোবাসার বেদনার, স্মৃতির, অভিমানের, প্রতারণার রাজনৈতিক রূপ ফুটে উঠেছে। 'চতুষ্কোণ' নাটকটিতে রাষ্ট্রের রাজনীতি না থাকলেও মানুষে মানুষে সম্পর্কের রাজনীতি বিদ্যমান হয়ে রয়েছে। তীব্র রাজনৈতিক বক্তব্য ব্রাত্য বসুর যে নাটকে সবথেকে বেশি ফুটে উঠেছিল তা হল 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটক। বিংশ শতকের সত্তরের দশকে ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণা, অবক্ষয়িত সমাজ বদলের রীতি 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকের মূল বিষয়।

ব্রাত্য বসুর রাজনৈতিক নাটকগুলির মধ্যে প্রথম নাটকটি হল 'অরণ্যদেব'। ১৯৯৮ সালে রচিত 'অরণ্যদেব' নাটকটিতে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা জানতে পারা যায়। ১৯৯০ সালে রামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে অযোধ্যায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয়। ১৯৯১ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়। এই দুই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের উত্তর

পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয় তীব্র রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'অরণ্যদেব' নাটকের মূল সুর স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

'অরণ্যদেব' নাটকে কল্প কাহিনীর ছদ্মবেশে মানুষের গভীরতর স্বপ্ন ও সংকটের কথা বলেছেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু। মোবাইল আর মঙ্গলযাত্রায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে অরণ্যদেব আধুনিক কালের জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অরণ্যদেব সাধারণ মানুষের কাছে অশরীরী। অরণ্যদেব মানুষের মতো পোষাক পরেন না। অরণ্যদেব মুখোশের আড়ালে ঢাকা, যিনি হাওয়ার মতো ক্ষীপ্র, অসীম ক্ষমতাধর, শক্তিশালী তিনি ৩০৯৯ সালে কলকাতায় এলেন। অরণ্যদেব এমন একজন অশরীরী, যিনি ভক্তের ডাকে রণে বনে সর্বত্র আসার অঙ্গীকারে বদ্ধ। 'অরণ্যদেব' নাটকের চরিত্ররা মূলত একটি পরিবারের, জেলুসিলের সংসার ভুক্ত। তখন মানুষ অমল, বিমল এই রূপনাম নয় পণ্য হিসেবে নামাঙ্কিত। জেলুসিলের বৌ লিমকা, ছেলে গুড্ডু, মেয়ে মারুতি। 'অরণ্যদেব' নাটকে নায়ক চরিত্রগুড্ডু। 'অরণ্যদেব' নাটকের কাহিনীর কাল ৩০৯৯ সাল। অল ডিটার্জেন্ট রাগবি টুর্নামেন্টের ফাইনালের দিন একটি ক্ষমতাবান আধুনিক পরিবারের গল্পের সূচনা।

৩০৯৯ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। বই এর অবলুপ্তি ঘটে গেছে, চ্যানেল ইন্টারনেট সর্বক্ষণের সঙ্গী। কল্প বিজ্ঞানের কল্যাণে ভারতবর্ষ দুনিয়ার প্রথম শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠেছে, বরং আমেরিকা, ইউরোপ দুর্বল দেশ। ভারতবর্ষে তখন হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা দেশ শাসন করছেন। গোটা পৃথিবীতে মার্কসবাদ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন, মানুষ নিজের নিজের মতো করে চলছে। উড়ে যাচ্ছে নেপচুন আর উইরেনাসে। এই রূপ পরিস্থিতিতে কলকাতায় আবিষ্কৃত হচ্ছে কলেজস্ট্রিট এবং সোনাগাছি। জেলুসিল কাজে দক্ষতা দেখাচ্ছেন যখন তাঁর স্ত্রী লিমকা, যিনি হিন্দুবাদী মন্ত্রী মণ্ডলীর সদস্যা। এক কঠিন ষড়যন্ত্রের স্বীকার হচ্ছেন। তার

পেছনে লেগেছে কোক। এর পাশাপাশি জেলুসিল বন্ধু আমূল তাঁর স্ত্রী ডেয়ারীর সঙ্গে ডিভোর্সে আগ্রহী। নাট্যকার এই নাটকে এখানে এক মজা সৃষ্টি করেছেন, তখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ছিল না, ছিল নারীতান্ত্রিক সমাজ, ছেলেরা মেয়েদের বিয়ে করে না, মেয়েরা ছেলেদের বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসে। মেয়েরা পীড়ন করে, আবার মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে এসে শাড়ী জুতো না ছেড়ে মারতে শুরু করে। 'অরণ্যদেব' নাটকে আমুল চরিত্রের মধ্যে এরকম অত্যাচারের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। পুরুষদের রক্ষার জন্য রয়েছে 'পুরুষ অধিকার রক্ষা সমিতি'। 'অরণ্যদেব' নাটকটির মূল ঘটনা জেলুসিল পরিবারের সংকট মোচন করতে তাদের ছেলে গুড্ডুর অরণ্যদেব কে আহ্বান।

রাষ্ট্র আর সমাজের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন অরণ্যদেবের মধ্যে ঘুরতে থাকে। বুদ্ধিজীবীরা 'পঞ্চম বিশ্ব' নিয়ে সেমিনারে ব্যস্ত। 'পঞ্চম বিশ্ব' সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য ছিল, জাপানে গরিবি হটাও আন্দোলন, ব্রিটেন চরম বেকারি, পশ্চিম ইউরোপে ব্রাজিলের অর্থনৈতিক অবরোধ, জার্মানির লোকসভায় অস্থিরতা, আমেরিকার না ক্ষেতে পেয়ে মরে যাওয়া প্রভৃতি এছাড়াও শক্তিমান ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতার আলোচনার বিষয় রয়েছে।

'অরণ্যদেব' নাটকে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিন্দুরাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছেন নাট্যকার। ৩০৯৯ সালে জন্মাবার পর, মন্দিরে নিয়ে গিয়ে গরম শিক দিয়ে পেছনে নীলচে রঙ্গের হিন্দু ছাপ দেওয়া হয়। হিন্দুত্বের এই বির্বতন সম্পর্কে ব্যঙ্গের কারণ তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা বুঝতে পারা যায়। 'অরণ্যদেব' নাটকে হিন্দুত্বের এক গোঁড়া রূপ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় জেলুসিল ও আমূল চরিত্রের মধ্যদিয়ে। জেলুসিল আর্কিওলজিক্যাল খোঁড়াখুঁড়ি করলে উচ্চারিত হয় আরও নাম, যেমন ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি,ওস্তাদ আলি আকবর খান। আমূল তখন বিস্মিত হয়ে বলে উঠে যে, এ তো মুসলিম নাম, জয় শ্রীরাম! কিন্তু এরা কারা জেলুসিল

বুঝতে পারছি না, এরা এই কালচার ব্যাপারটাকে বড় করে তুলছে নাকি রাজনৈতিক দিককে বড় করে তুলছে। নাকি এরা হিন্দুত্বের বিরোধী ছিল সেটাই খুঁজছিলাম। আবার আমূল বলে উঠে এরা কি মেটাডাইল অটলকৃষ্ণ যুগের টেম্পোরারি? এই অটলকৃষ্ণ সম্ভবত অটলকৃষ্ণ বাজপেয়ী। অর্থাৎ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিত্র স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায় 'অরণাদেব' নাটকে।

'অরণ্যদেব' নাটকের নায়ক গুড্ডু পনেরো-ষোলো বছর বয়সি কল্পণাপ্রবণ ছেলে।গুড্ডুর পিতা জেলুসিল, মাতা লিমকা, ও দিদি মারুতি। লিমকা মন্ত্রী, জেলুসিল আর্কিওলজিস্ট, প্লুটোতে চাকরির জন্য আবেদন পাঠিয়েছে। গুড্ডুর স্বপ্ন আর কল্পনা অরণ্যদেব আর বেতালকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়। 'অরণ্যদেব' নাটকে যান্ত্রিকতার দিকে ধাবিত মানুষগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম গুড্ডু। সে ৩০৯৯ সালে পক্ষে এত বেমানান যে তার নাম স্পনসর করতে আগ্রহী নয় কোনো কোম্পানী, তাই তাকে গুড্ডু হয়ে থাকতে হয়। যে যুগে স্কুলে দেখানো হয় থ্রি এক্স পর্নোগ্রাফ, দিদি ভাইয়ের কাছে নিরোডম চায়, বাবা প্লুটোতে চাকরি নেওয়ার কথা ভাবে সেই যুগেও গুড্ডুর ফেবারিট হিরোর নাম ফ্যন্টম। অরণ্যদেব কে নিয়ে গুড্ডুর স্বপ্ন দেখার ফলে আতঙ্কিত মা লিমকা ও দিদি মারুতি। এ যুগে এডস আর ক্যান্সার সামান্য রোগ। কিন্তু জ্বর ও আমাশা মারণব্যধি। নাটকের শেষে গুড্ডুর প্রশ্ন 'আচ্ছা আমাদের কি সত্যি একেবারে চলে যেতে হবে? নাট্যকার 'অরণ্যদেব' নাটকের শেষে আশার বানী শুনিয়ে যায়, এমন একদিন আসবে যখন গুড্ডুরাই হয়ে উঠবে 'নিশ্চিত লিডার'।

ওই গুড্ডু নয়, ৩০৯৯ সালে কোকের মতো রাষ্ট্রনেতারা যুবশক্তির ক্ষমতার পুরোটা ব্যায় করেছিল করসেবা, মিসাইল ছোঁড়া, পর্নো দেখা আর মারিজুয়ালা সেবনের দীক্ষা দিয়ে সব আশা ভরসা ব্যার্থ করে গুড্ডুর মতো সংবেদনশীল ছেলেরা ফিরে আসবে। আর তার রাষ্ট্রযন্ত্র ভীত, সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত হয়ে উঠবে।

'অরণ্যদেব' নাটকটি একটি রাজনৈতিক ফ্যান্টাসি। কমিকস হিসেবে 'অরণ্যদেব' পরিচিত হলেও চরিত্র-চিত্রন, ভাষা-ভঙ্গিমা, বিষয়বস্তু প্রভৃতি প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে নির্দেশ করে। ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা অরণ্যদেব' নাটকে স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক সমস্যা গুলো 'অরণ্যদেব' নাটকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নাট্যকার।

'শহর ইয়ার' নাটকটি ব্রাত্য বসুর রচনা করেন ২০০১ সালে। 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকে যেমন দলগত রাজনীতি রয়েছে, 'শহর ইয়ার' নাটকে দলগত রাজনীতি নেই। কিন্তু মানুষের অন্তর্নিহিত জটিলতাকে উন্মোচিত করতে থাকে 'শহর ইয়ার' নাটকে। তরঙ্গ নামে একটি ছেলের শহুরে সংস্কৃতির সঙ্গে মেশা এবং শেষে শহরের সংস্কৃতির চালচিত্রটি পর্যবেক্ষণ এর মধ্যে রাজনীতির বাতাবরণ লক্ষ্য করা যায়। শহর কলকাতা ভালোবাসা, বেদনার, স্মৃতির, উচ্ছাসের, শোকের, প্রতারণার শহর। এখানে দালাল, ফড়েবাজ, ঠকবাজ, বুদ্ধিজীবী, করণিক, ভিখিরি, চোর, বেশ্যা, রাজনৈতিক ব্যক্তি বর্গ সবাই একসঙ্গে বসস্থান করে।তরঙ্গের বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার এক গ্রামে। বাবা-মা নেই, বাড়িতে আছে কাকা-কাকি, তার দুই ছেলেমেয়ে, আর তরঙ্গকে যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সে বুড়ি ঠাকুমা। তরঙ্গ সেই বুড়ি ঠাকুমার কাছেই থাকে। পড়াশুনার পাঠ অনেক আগেই সে বন্ধ করে দিয়েছে। এখন শুধু পাড়ার যাত্রা হলে দাদুর ভাঙ্গা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে পড়ে জুড়ির দলে গান গায়। 'লোকে করে ঠাট্টা মিঠা শুনে আমার রঙ্গ/দেখো কেমন ছোকরা গাঁয়ের তোমাদের তরঙ্গ'। অর্থাৎ তরঙ্গের ভবঘুরে জীবনের এক পরিচয় পাওয়া যায় 'শহর ইয়ার' নাটকে।

গ্রাম্য ব্যবসায়ী সাহা বাবু বাজারে লোকের সামনে বসে তরঙ্গকে কাজের প্রসঙ্গ বললে, তরঙ্গ উত্তরে বলে আমার কাজের দরকার নেই কাকাবাবু। সবাই নিজের ভালো চায় আমি না হয় চাইলাম না নিজের ভালো। সেই রাতেই তরঙ্গ গ্রাম ছাড়ল। এক স্টিমারে সারেঙ্গের কাছে কাছি

টানল কিছুদিন, তারপর এক মাছের ট্রলারে সময় কাটায়। মাঝবয়সি একজন লোক বঙ্কু বিশ্বাসের সঙ্গে তরঙ্গের দেখা হয়। ঘটনাক্রমে বঙ্কু বিশ্বাসের পকেট থেকে একটা কাগজ পড়ে যায় তাতে লেখা আছে, কানঞ্চন কুমার অভিনীত, ধন্বন্তরী অপেরা প্রযোজিত যাত্রাপালা 'দুরন্ত লাদেন'। অর্থাৎ সময় বসত করে ব্রাত্য বসুর নাটকে। 'দুরন্ত লাদেন' যাত্রাপালার প্রসঙ্গে মনে পড়ে ওসামা বিন লাদেনকে মৌলবাদী ও সন্ত্রাসবাদী মুসলমান যে, পশ্চিম দুনিয়ার ত্রাস তৈরি করেছিল তার কথা।

তরঙ্গের জীবন এক ভবঘুরে জীবন। সে বাধাধরা জীবনে থাকতে চায় না কিন্তু তাকে চণ্ডীপোতার একটা গানের দলে ডুকিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় বঙ্কু বিশ্বাস। গ্রামের জীবন থেকে শহুরে জীবন খুবই জটিল, তরঙ্গ ছেলেটিকে গ্রাম থেকে শহুরে যাওয়ার পথে নানা বাধা বিপত্তি পের হতে হয়েছে। নবগোপাল অপেরার ম্যানেজার নকুল নন্দী তরঙ্গকে কোলকাতার যাত্রা দলে ঢুকিয়ে দিবে বলে ঠকিয়ে দুশো টাকা নিয়েছিল। তারপর তরঙ্গের দেখা হয় বয়স পঁচিশের টুবলুর সঙ্গে, টুবলুর এক গানের টিম ছিল যার টিমটায় ছিল চারজন। টুবলু সে বাজাত ড্রাম আর কঙ্গো, আর একজন মন্টি, সে বাজাত বেশ গিটার। আর একজন হিয়া সে বাজাত সিন্থেসাইজার। চতুর্থজন ওদের ক্যাপ্টেন মানে যাকে বলে পালের গোদা বাবু সে বাজাত সিঙ্গার। ক্যাপ্টেন তরঙ্গকে নাম জিজ্ঞেস করায় সে বলে তরঙ্গ সরকার। তরঙ্গকে আরও বলে যে শহরে থাকতে হলে অনুসন্ধান, খোঁজা, অন্বেষণ এ গুলো নিঃশব্দে করবে।

গানের দলের লিডার বাবু যখন যথার্থ গানের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় তখনও তরঙ্গ তার আত্মবোধ উপলব্ধিতে সাহায্য করছে। বাবুর সমস্যা একজন স্রস্টার সমস্যা। বাবুর বাড়ি শহরের ছোটো ঘিঞ্জি পরিবেশে। বাবুর বড়দা বামপন্থী রাজনীতি করত, সত্তরের দশকে পুলিশের গুলি খেয়ে মারা যায়। মেজদা অফিস ক্লার্ক কোনো রাজনৈতিক দলে যোগদান

করেননি। বাবুর মূল লক্ষ্য নতুন গান খোঁজা, অনুসন্ধান, অন্বেষণ করা। বাবুর আর তরঙ্গ সেই আলোর সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তরঙ্গের জীবনের গভীরতম স্পন্দন অনুভূত হয় 'শহর ইয়ার' নাটকে।

'কবি' থেকে 'নগর কীর্তন' পর্যন্ত অনেক বাংলা নাটকে গান হয়ে উঠেছে নাটকের প্রাণ ও চরিত্র। 'শহর ইয়ার' নাটকে নতুন গানের স্বপ্ন, লড়াইকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। বাবুর নির্দষ্টভাবে নতুন গানের সন্ধানে আত্মক্ষয় করে। প্রতিষ্ঠার ফাঁদে পা দেয় না কিন্তু নিজেকে বঞ্চনা করে রাখে নতুন গানের আশায়। কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক রাজনৈতিক টানা পোড়নের ফলে বাবুর কাছ থেকে গান দূরে চলে যেতে থাকে। আবার বাবুর সঙ্গীরা একে একে ছেড়ে যায় তাকে।কিন্তু তরঙ্গ বাবুর গানের ভাবকে নানা আঘাতে জাগাতে চায়, ফেরাতে চায় তার জীবনের কাছে, গানের কাছে। কিন্তু শিক্ষিত বাবুর সঙ্গে অশিক্ষিত তরঙ্গ থাকলেও শেষে তাদের মধ্যে রাগ-অনুরাগের সূক্ষতম অনুভূতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তরঙ্গ বাবুকে ছেড়ে চলে যায়।

প্রতিটি বিচ্ছেদই আসলে মৃত্যুর মতো। যে মৃত্যু অনুভূত, যার কোনো স্পষ্ট চালচিত্র নেই। পাওয়া না পাওয়ার টানাপোড়নে লড়াই যেন এক রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করে 'শহর ইয়ার' নাটকে।

.২০০১ সালে ব্রাত্য বসুর অপর একটি রাজনৈতিক নাটক হল 'চতুষ্কোণ। রাষ্ট্রের রাজনীতি না থাকলেও মানুষে মানুষে সম্পর্কের রাজনীতি বিদ্যমান 'চতুষ্কোণ' নাটকে। ত্রিকোন প্রেমের সম্পর্ক নয়, চতুষ্কোণ প্রেমের সম্পর্ক। একটি নারী ও তিনটি পুরুষ চরিত্র। নারী দুটি পুরুষকে বঞ্চনা করে তৃতীয় পুরুষের দিকে ধাবিত হয়। এ নাটকে আছে মানুষের মনের অন্ধকার, অপরাধের যুক্তি, খুনির মনস্তত্ত্ব। 'চতুষ্কোণ' নাটকের কেন্দ্রে আছে এক নারী নীপা বটব্যাল।

নীপা বটব্যাল চন্দ্রেশেখর বটব্যালের, সুন্দরী, সংবেদনশীল স্ত্রী। তার স্বামী চন্দ্রশেখর ভোঁতা, স্থূল মানুষ। পরস্ত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে আদি রসাত্মক সংলাপ ও বউকে অবসরে অশ্লীল রসিকতা শোনানোর ভঙ্গিতে তার রুচি ফুটে ওঠে। নীপার প্রেমিক সৌম্য সরখেল, বয়স ত্রিশ, নার্ভাস, হতাশ, স্নায়ুরোগী চন্দ্রশেখরের অফিসের কর্মী। আর একটি চরিত্র পাওয়া যায় তিনি হলেন ফারুখ ইনতিয়াজ, ইনি রাবনের ছেলে ইন্দ্রাজিৎ, অপর নাম মেঘনাদ। ফারুখ ইনতিয়াজও নীপার প্রেমিক।

হত্যারহস্য মূলক নারী-পুরুষের সংকটময় প্রেমের জটিলতার রূপ ফুটে উঠেছে 'চতুষ্কোণ' নাটকে। নীপার ভালোবাসার মানুষ হল সৌম্য সরখেল। নীপা ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে জীবন কাটানোর জন্য, নীপা তাঁর স্বামী চন্দ্র শেখর বটব্যাল কে হত্যার জন্য সৌম্যর সঙ্গে পরিকল্পনা করে। নীপা প্রেমিক সৌম্যকে কথার ছলে উত্তেজিত করে চন্দ্রশেখকে হত্যা করতে বলে। এবং সৌম্য নিজেকে সামলাতে না পেরে চন্দ্রশেখরকে রিভলভার দিয়ে খুন করে। কিন্তু চন্দ্রশেখরকে হত্যার পরই নীপা সৌম্য সরখেলকে পুলিশে দেওয়ার কথা বলে। সৌম্য তাতে জানতে পারে নীপার ষড়যন্ত্র। আসলে নীপা ভালোবাসে ফারুখ ইনতিয়াজকে।সৌম্য নীপার ষড়যন্ত্র জানতে পেরে শেষপর্যন্ত বালিশ চাপা দিয়ে নীপাকে খুন করে।

সৌম্যর মধ্যে নীপাকে ভালোবাসার তীব্র আর্তনাদ দেখা দিয়েছিল, সৌম্যর উক্তিতে তা স্পষ্ট।সৌম্য নীপাকে পৃথিবী থেকে তুলে এনে এক অন্য জগতের রূপ দিয়েছিল। তাকে বিশ্বাস করে বলেছিল 'তুমিই আমার শিল্প, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার ঘৃণা, আমার গরম বিশ্বাস'। কিন্তু শেষে সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পর্কের রাজনৈতিক টানাপোড়নের চিত্র সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু তার 'চতুষ্কোণ' নাটকে।

‘চতুষ্কোণ’ নাটকটিতে ইতিহাসের কোনো বিশেষ আবহনেই। নিখুঁত একটা ষড়যন্ত্রের নির্মাণ, একটি আসন্ন হত্যার সম্ভাবনা তাতে নাটক আরও উত্তেজনা প্রধান হয়ে উঠেছে। অভিমান, গঞ্জনা, প্রেমপূর্ণ ভালোবাসার উদ্দামতা ‘চতুষ্কোণ’ নাটকটিতে প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ‘চতুষ্কোণ’ নাটকে নাট্যকার ব্রাত্য বসু সময় আর নাটকের সঞ্চায়নের আসল সময় সীমাকে এখানে মিলিয়ে দিয়েছেন। রাষ্ট্র বা দেশের রাজনীতি না থাকলেও মানুষে মানুষে সম্পর্কের রাজনীতি বেশ স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ রয়েছে ‘চতুষ্কোণ’ নাটকটিতে।

তীব্র রাজনৈতিক বক্তব্য ব্রাত্য বসুর যে নাটকে সবথেকে বেশি ফুটে উঠেছিল তা হল ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’। নাট্যকার ব্রাত্য বসু নাটকটি রচনা শুরু করেন ২০০১ সালের আগস্ট মাসে, শেষ করেন ডিসেম্বর মাসে। অর্থাৎ নাটকটির রচনা কাল ২০০২ এবং নাটকের সময়কাল ২০০১। বিংশ শতকে সত্তর এর দশকের ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রণা, অবক্ষয়িত সমাজ বদলের রীতি নাটকের বিষয় কে পরিস্ফুট করেছে। নাটকের নায়ক সব্যসাচী সেন একজন রিপ ভ্যান উইঙ্কল। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে এক পার্কের পুলিশ কাস্টডি থেকে উধাও হয়ে ,পুলিশের তাড়া খেয়ে আত্মগোপন করে। তারপর আবার হঠাৎ ২০০২ সালের জানুয়ারি মাসে সে একই পার্কে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে। তারপর ধীরে ধীরে বুঝে নেয়, ছাব্বিশ বছরে সময় ও সমাজ বদলে গিয়েছে আশপাশ, ধ্যান-ধারনা, মানুষজন, রাস্তাঘাট। সে একজন কমিউনিস্ট এবংসি.পি.আই(এম) এর সক্রিয় কর্মী। সে এই সমাজ বদলে দেওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল এবং ২০০২ সালে এসে দেখতে পায়, এ সব স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই। সব্যসাচী সেনের ছেলে ইন্দ্র বাবার বিপরীত মেরুর রাজনীতি অর্থাৎ তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত। মেয়ে ইন্দ্রানী চারপাশ সম্বন্ধে অজ্ঞাত থেকেও সময়ের স্রোতে ভেসে থাকে। স্ত্রী রাজলক্ষী পুরনো স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে

থাকে। চারপাশের পাল্টে যাওয়া পরিবেশকে সব্যসাচী চিনতে না পেরে বিভ্রান্ত হয়, বিস্মিত মূক সব্যসাচী কোনো দিশা খুঁজে পায় না।

প্রত্যেক নাটকের বিষয়বস্তুতে নাট্যকার তৎকালীন সমাজের চিত্র তুলে ধরেন। 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকে আমাদের দেশ তথা ভারতবর্ষের সমাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক পরিস্ফুট করেছেন। বিংশ শতকের সত্তরের দশকে অশান্ত কলকাতায় জরুরি অবস্থার সময় বিপ্লবের রূপরেখার দেখা মিলেছে। বামফ্রন্ট দল ক্ষমতার লোভে সংসদীয় গণতন্ত্রের চোরাবালিতে আটকে গেছে। এই বক্তব্য গুলিকে জোরদার করার জন্য বিশ্ব জুড়ে ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনের মহানায়ক কমরেড় স্তালিনের বিখ্যাত বক্তব্যকে সুন্দর ভাবে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার। স্তালিন মনে করতেন বলশেভিক পার্টি গোটা পৃথিবীকে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে। স্তালিন বলশেভিক পার্টি অনেকটা গ্রীক পুরাণের বীর আন্টিয়াসের মতো বলে মনে করেছেন।আন্টিয়াসের শক্তির উৎস ছিল মাটি।যদি মাটি থেকে উৎস আন্টিয়াসকে তুলে ফেলা যেত তা হলেই তাঁর মৃত্যু ছিল অবধারিত। এইটাই ছিল পরিক্রমশালী আন্টিয়াসের নিয়তি।ফলে একদিন হারকিউলিস আন্টিয়াসকে মাটি থেকে শূণ্যে তুলে নিয়ে তাঁকে গলা টিপে হত্যা করেন। আন্টিয়াসকে পার্টির সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ যতদিন পার্টি মাটি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখবে,ততদিন তারা অপরাজেয় থাকবে। কিন্তু যে মূহূর্তে তারা মাটি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ হারাবে, সেই মুহূর্তে তাদের পতন হয়ে উঠবে আসন্ন তথা অনিবার্য। ছোট সব্যসাচী স্তালিনের দ্বারা উজ্জীবিত হয়েছিল।

অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে ভারতীয় স্বাধীনতার চরিত্র, ভারতের রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্র, ভারতীয় বিপ্লবের স্তর, বিপ্লবের নেতৃত্ব ইত্যাদি বিষয়ে এক দীর্ঘ মতাদর্শগত বিতর্কের মধ্য দিয়ে ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী) রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

পৃথিবীর বড় বড় দুটি কমিউনিষ্ট পার্টি সোভিয়েত আর চীন দ্বারা মতাদর্শগত ভাবে আক্রান্ত হয়েও এই পার্টি সংশোধনবাদ ও সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম করে ভারতের আজ বড় কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এই সময় ভারতবর্ষে খোলা বাণিজ্যে প্রবেশিকরণ ঘটে। টাকার অবমূল্যায়ণ ঘটার পর আমদানির উপর থেকে শুল্ক কমে গেল, রপ্তানিকে উৎসাহ দিয়ে বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হল। বিমা, ব্যাংঙ্কিং, দূরসংযোগ, বিমান ভ্রমণ সবক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ শুরু হল। শুরু হল রিমোট সেন্সিং ব্যবস্থা অর্থাৎ উপগ্রহ যোগাযোগ ও ইন্টারনেটের বিকাশ। বিশ্ব বাজার এক নতুন রূপে সকলের কাছে উপস্থিত হল।অথচ বিংশ শতকে শেষ তিরিশ দশকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে আঞ্চলিক শ্রেণীঘটিত বৈষম্য প্রকট হল।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, পঞ্চাশের খাদ্য আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, চিন-ভারত যুদ্ধ, ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলন, নকশাল বাড়ি প্রভৃতি আন্দোলন ভারতীয় সমাজ কে অসহনীয় করে তুলেছিল। আবার বিংশ শতকে শেষের দিকে ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক উদ্বেগ প্রবণ হয়ে উঠেছিল। ১৯৮৪ সালের ভয়াবহ দাঙ্গা, ১৯৯৯ সালে কার্গিল যুদ্ধ, ভারতে একের পর এক ধর্মীয় দাঙ্গা, ভারতের সমাজ কে দুর্বিষহ করে তুলেছে। ১৯৯৯ সাল থেকে পাঁচ বছর ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্রে শাসন শুরু করল। তা ছাড়া মাওবাদীদের প্রভাব অনেক অঞ্চলে প্রকাশ পেয়েছিল। এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট(মার্কসবাদী) যে ভাবে পশ্চিমবঙ্গে শাসন শুরু করেছিল সে ভাবে বজায় না থেকে ক্রমশ তা দুর্বল হতে থাকল। প্রাশাসনিক ও রাজনৈতিক কাজকর্মকে ঘিরে ধীরে ধীরে মানুষের মনে উত্থাপন শুরু হল তার প্রতিফলন স্বরূপ এই নাটক ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’।

ব্রাত্য বসুর পিতা বিষ্ণু বসু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন নামকরা নেতৃত্ব ছিলেন। কিন্তু ব্রাত্য বসু ডানপন্থীর সমর্থক।‘ উইঙ্কল টুইঙ্কল’ নাটকের চরিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, পিতা সব্যসাচী সেন কমিউনিস্ট অর্থাৎ বামপন্থী কর্মী সমর্থক, আর পুত্র ডানপন্থী কর্মী সমর্থক। স্বাভাবিক ভাবে পাঠক বা শ্রোতার মনে হতে পারে যে ব্রাত্য বসুর ব্যক্তিগত ভাবধারা নাটকের বিষয়। কিন্তু ব্রাত্য বসু ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ নাটককে রাজনৈতিক নাটক বলে উল্লেখ করতে চাননি। ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ দুটো সময়ের গল্প,দুটো ব্যক্তির গল্প। হ্যাঁ তাঁর মধ্যে রাজনীতি আছে। তার সঙ্গে দুটো ব্যক্তি মানুষের যন্ত্রনা আছে, তার মধ্যে একটা মানুষের না পারা আছে। একটা মানুষের না পারার আর্তনাদ আছে। আবার একটা মানুষের সময়কে বোঝার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়া আছে। ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ নাটক মূলত এটারই গল্প। অর্থাৎ সেই সময় এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে ব্যক্তিকে কোনো না কোনো পক্ষকে অবলম্বন করতে হবে। তাই ‘উইঙ্কল টুইঙ্কল’ নাটকে সব্যসাচী বামপক্ষ ও সব্যসাচীর ছেলে ইন্দ্র ডানপক্ষ নিয়েছিল।

সব্যসাচীর সঙ্গে তাঁর ছেলে ইন্দ্রের যে ব্যবধান তৈরি হয়, সে রকম ব্যবধান তৈরি হয়েছিল একটা সময় সব্যসাচীর সঙ্গে তাঁর বাবা বিনয়ভূষনের। এই বোঝা না বোঝার খেলা সময়ের সঙ্গে তাল মিলেয়েই চিরন্তন তার রূপের বদল হয় মাত্র। কিন্তু নিজের নির্মাণ যখন নিজেরই পরিবর্তিত পরিস্থিতির স্রষ্টা হয়ে উঠে, তখন হিসেব মিলেনা। তাই ইন্দ্র, সব্যসাচী, রাজলক্ষীর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ক্তহা জানতে পারা যায়। ১৯৭৬ সালের বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী সব্যসাচী পুনরায় যখন ২০০২ সালে জানুয়ারী মাসে একই পার্কে উপস্থিত হয় তিনি নিজেকে মেলাতে পারছেন না চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে। ইন্দ্র তার মা রাজলক্ষীকে বারবার বলছেন সব্যসাচীকে উদ্দেশ্য করে, ওনাকে সত্যিটা বুঝতে দাও, এটা জানুয়ারী মাস ২০০২ সাল। গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পালটে দেওয়ার হাওয়া বইছে। সব্যসাচী

বলে উঠেন এখন জরুরি অবস্থা, ইন্দ্র বলেন এখন শীতল অবস্থা, তিনি আরও বলেন যে। সেটা ১৯৭৬ নয়, এটা ২০০২ এর জানুয়ারী ঠাণ্ডা। ইন্দ্র বলেন সব্যসাচীকে যে আপনি পক্ষ নিন, পক্ষ না নিলে রিপভ্যান উইঙ্কল এর মতো, সেও ঘুম থেকে উঠে নিজেকে চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে মেলাতে পারবেন না।

অর্থাৎ 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকে রাজনীতি পার্টিজান নেই, দুটি সময়কে নির্মোহভাবে ধরার চেষ্টা আছে। কোনো পক্ষের বা বিপক্ষের কথা বলতে চাননি নাট্যকার। বলতে চেয়েছেন পক্ষ না নিলে রিপ্ ভ্যান উইঙ্কেলের মতো অবস্থা খারাপ হবে। সব্যসাচী তাই অবক্ষয়িত সামাজের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বারাবার, মিলতে না পারা, মেলাতে না পারার যন্ত্রণা 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকে বারবার ফিরে এসেছে। ইন্দ্রের মধ্যে দৃড় বলবানে পুষ্ট এক সুন্দর দক্ষিনপন্থী ভাবধারা কে ফুটিয়ে তুলেছেন। ইন্দ্র দৃড় সচেতন মনোভাব পেয়েছে তার বাবার কলে শুয়ে যখন সে শুনত, 'কারার ই লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট/ রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি'। অর্থাৎ আপাত, চাপা আর্তনাদ যেন ঝরে পড়েছে 'উইঙ্কল টুঙ্কল' এর নায়ক ইন্দ্রর মধ্য দিয়ে।

'উইঙ্কল টুইঙ্কল' নাটকের দৃষ্টিভঙ্গি এক সুদূর প্রসারী। নাটকটি বাস্তব নির্ভর সমসাময়িক প্রেক্ষাপটধর্মী, যার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দিক বেশি করে ফুটে উঠেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

২০০৩-২০০৭ পর্বের রাজনৈতিক নাটক

নাটক সমাজের দর্পণ। নাট্যকারের শিল্পী সত্তার মধ্যে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের প্রতিবাদী চেতনা ফুটে উঠে। নাট্যকার ব্রাত্য বসুর নাটকগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা ফুটে উঠেছে। ২০০৩ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে নাট্যকার ব্রাত্য বসু যে রাজনৈতিক নাটকগুলি রচনা করেছিলেন সেগুলি হল 'ভাইরাস এম'(২০০৩), '১৭ই জুলাই'(২০০৪), 'কৃষ্ণগহ্বর'(২০০৭), 'ভয়'(২০০৭)।

'ভাইরাস এম' নাটকটি ২০০৩ সালে রচনা করেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অনুভূতির দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায় 'ভাইরাস এম' নাটকে। '১৭ই জুলাই' নাটকটি ব্রাত্য বসু ২০০৪ সালে রচনা করেন। '১৭ই জুলাই' নাটকটিতে উঠে এসেছে এক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। ২০০৩ সালে জুলাই মাসে গুজরাটের 'পাঁচমহল' জেলার অন্তর্গত 'এরল' গ্রামের একটি ঘটনা নিয়ে '১৭ই জুলাই' নাটকের আখ্যান রচিত হয়। আসিফ মির্জা ও আরও কয়েকজন মুসলিম ছেলেকে জড়ানো হয় একটি মিথ্যা ধর্ষণ মামলায়, এই মামলার সূত্রে পরস্পর মুখোমুখি হয় রাজনৈতিক আইন ব্যবসায়ী পঙ্কজ পারেখ ও সতত সংগ্রামী লড়াকু আইনজীবি রাকেশ চ্যাটার্জী। মামলা চলাকালীন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ভারতবর্ষের রাজনীতি ধর্ম ও আরও নানান অবস্থার প্রকৃত চালচিত্র। আসিফরা বাঁচতে পারবে কিনা এই নিয়ে পাঠকের মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়। নাট্যকার ব্রাত্য বসু '১৭ই জুলাই' নাটকে পাঠকের জিজ্ঞাসু মনের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকটি ব্রাত্য বসু ২০০৭ সালে জুলাই মাসে রচনা করেন। এই নাটকে পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ছাপ কিছুটা লক্ষ্য করা যায়। 'কৃষ্ণগহ্বর'

নাটকটিতে সমকামিতার জীবনের রাজনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে এক অস্থিরতা বোধ কাজ করে। ২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাত্য বসু ‘ভয়’ নাটকের খসড়া তৈরি করেন। আবার সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় ‘ভয়’ নাটকটি লেখেন ‘পূর্ব পশ্চিম’ নাট্যপত্রের জন্য। ‘ভয়’ নাটকটি মূলত ভূতের নাটক হলেও, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি উত্থান পতনের অবস্থা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু।

‘ভাইরাস এম’ নাটকে মানুষের আগের রূপ অর্থাৎ বাঁদরে পরিণত হচ্ছে শহরের মানুষজন। রূপান্তরী নামে ছোট মফসস্‌ল শহরের অন্তর্গত মানুষের এই রূপ উল্টো বিবর্তন মানুষের ভিতরকার জন্তুর বহিপ্রকাশ ঘটে। মফসস্‌ল শহরের ‘মানবিকীকরণ’ এজেন্সি ছিলেন বহিত্র বসু। বহিত্র বসুর সহকারী কর্মচারী হলেন বছর বাইশের পল্লবী বন্দোপাধ্যায়। পল্লবী খুবই সংবেদনশীল নারী। বহিত্রর মতো অতো গভীর আর গম্ভীর কথা বোঝে না। তবে পল্লবী বহিত্রকে শ্রদ্ধা করে। পল্লবী বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে তার ঘর সংসার চালিয়ে যান। পল্লবীর প্রেমিক নীলাঞ্জনা বিশ্বাস করে নেতিবাচকতায়। তার দ্বারা সংস্কার, উন্নয়ন, প্রগতি সব শব্দে বিশ্বাসী নয়। বহিত্রর আচার-আচরণে সে জালিয়াতির সন্ধান পায়। এবং নীলাঞ্জন বহিত্রর পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নয়। তাই তার অফিসের কাজে পদত্যাগ করে টেলিফোনে সে কথা জানায় প্রেমিকা পল্লবীকে।

‘রূপান্তরী’ শহরে উদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে প্রতিনিয়ত। মূলত এক প্রকার ভাইরাসের প্রভাবে মানুষের এই রূপ পরিবর্তন অর্থাৎ মানুষ ক্রমশ বাঁদরে পরিণত হচ্ছে। যে ভাইরাসের প্রভাবে এই রূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হল ‘মাংকিস্যাপিয়েন্স বিয়িং’। বহিত্র বসু আগেই জানতে পেরেছিলেন যে মানুষ বিবর্তনের ফিরতি পথে হাটছে। বহিত্র বসু সেই খবর যেন আগেই পেয়ে গিয়েছিলেন, সেই জন্য তিনি মানবত্রাতা রূপে মানবিকীরণের প্রতিষ্ঠান খুলেছেন। কিন্তু কোনো

রোগী এখনও জুটেনি তবে একজন এসেছেন,যার পেছনে লেজের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। এর পর নাটকটিতে রাজনৈতিক প্রহসনের ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায়। শাসক দল এবং বিরোধী দল সব দলের এমনকি থানার কর্তাদেরও বাঁদরায়নের সংবাদ আসে।

মানুষ থেকে বাঁদরে পরিণত হওয়া এক বিবর্তনের উল্টোপথে যাত্রার রূপকে বর্ণনা করে নাট্যকার ব্রাত্য বসু তার 'ভাইরাস এম' নাটকে। 'ভাইরাস এম' নাটকে দেখা যায় অবক্ষয়ী মনুষত্ত্বের সংকট রূপ। শহরের চেয়ারম্যানের হম্বিতম্বি, ক্ষমতার আস্ফালন, দুর্নীতির বাড়াবাড়ি, ভাইস চেয়ারম্যানের প্রতিষেধক সংগ্রহে ব্যর্থতা, চেয়ারম্যানের মস্তান ছেলের বাঁদর বনার দুঃসংবাদ সব কিছুতেই সৃষ্টি হয় এক প্রহসন। মূলত 'ভাইরাস এম' নাটকে রূপান্তর মূল বিষয়, এমন একটা জগতের কথা আছে যেখানে ক্রমশ চেতনার স্তর থেকে অবচেতনের স্তরে চলে যায় বক্তব্য। দুই প্রতিপক্ষ চরিত্রের রূপান্তর ঘটে কিন্তু বহিত্র ও নীলাঞ্জন বাঁদর হয়না। বহিত্রের সত্য ও সেই সত্যের বিশ্বজনীন প্রসারে বিশ্বাস নেই নীলাঞ্জনার। অর্থাৎ বহিত্রের মতে হ্যাঁ টাই শেষ কথা, আর নীলাঞ্জনার মতে না টাই বড় কথা। এই দুটি মতের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ চলতে থাকে। নীলাঞ্জন চায় চূড়ান্ত ও মৌলিক পরিবর্তন যার ফলে নাশকতাবাদী সুস্থ মানব জীবন। তা ছাড়া নীলাঞ্জন মনে করে বহিত্র তার প্রেমিকার প্রতি বিশেষভাবে প্রসন্ন, তাই কোনো কাজের নির্দেশ ছাড়াই পল্লবী মাসিক বেতন নিয়ে চলে। বহিত্রর মধ্যে বেতন দিয়ে চলাটা অসহনীয় মনে হয়। নাটকের শেষে নীলাঞ্জনার প্রেমিক পল্লবী মানেবেতর প্রাণীতে পরিণত হয়। নাশকতার বিরোধিতায় দেবদূত নীলাঞ্জন চরিত্রটি,তাই বহিত্রর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে থাকে।

অর্থাৎ ‘ভাইরাস এম’ এমন একটি নাটক যাতে দর্শন আছে, রাজনীতি আছে। আর সেই রাজনীতিতে একটা লোক ক্ষমতায় অংশ নিবে কি নিবে না, তা নিয়ে তার ব্যক্তিগত অনুভূতির দ্বন্দ্ব আছে।

‘১৭ ই জুলাই’ নাটকটি ব্রাত্য বসুর মৌলিক নাটক নয়। এক বিখ্যাত মার্কিন নাটকের কাছে সর্বতোভাবে ঋণী। নাট্যকার জন ওয়েক্সলি ১৯৩৪ সালে ‘they shall not die’ নাটক রচনা করেন। এই নাটকের অনুরূপ উৎপল দত্ত ‘মানুষের অধিকার’ নামে একটি নাটক রচনা করেন। নাট্যকার ব্রাত্য বসু ২০০৩ সালে উৎপল দত্তের ‘মানুষের অধিকার’ নাটকের রিমেক রচনা করেন ‘১৭ই জুলাই’ নামে।

‘১৭ই জুলাই’ নাটকটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার আগে ‘মানুষের অধিকার’ নাটকটির প্রেক্ষাপট দেখে নিলে বোঝা যাবে যে নাটকটি তাৎপর্যতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। উৎপল দত্ত জেল থেকে বের হওয়ার পর ‘মানুষের অধিকারে’ নাটকটি রচনা করেন। মার্কিন সাম্যবাদী নাট্যকারের প্রতিবাদ একজন স্ট্যালিনপন্থী ভারতীয় কমিউনিস্টের যতটা বদলাতে পারে, ঠিক ততটা বদলেছে উৎপল দত্তের নাটকে। ১৯৩১ এর কুখ্যাত স্কট-সবরো মামলা অবলম্বনে মার্কিন কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের রূপ নিয়ে ‘মানুষের অধিকার’ নাটক রচনা করেন।

বিংশ শতকে আটের দশকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ব্রাত্য বসু ‘১৭ই জুলাই’ নাটক রচনা করেন।গুজরাটের ‘পাঁচমহল’ জেলার অন্তর্গত ‘এরল’ গ্রামের একটি ঘটনা নিয়ে ‘১৭ই জুলাই’ নাটকের আখ্যান রচিত হয়। আসিফ মির্জা ও আরও কয়েকজন মুসলিম ছেলেকে জড়ানো হয় একটি মিথ্যা ধর্ষণ মামলায়, এই মামলার সূত্রে পরস্পর মুখোমুখি হয় রাজনৈতিক আইন ব্যবসায়ী পঙ্কজ পারেখ ও সতত সংগ্রামী লড়াকু আইনজীবি রাকেশ চ্যাটার্জী। মামলা চলাকালীন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে ভারতবর্ষের রাজনীতি ধর্ম ও আরও নানান

অবস্থার প্রকৃত চালচিত্র। আসিফরা বাঁচতে পারবে কিনা এই নিয়ে পাঠকের মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয়। নাট্যকার ব্রাত্য বসু '১৭ই জুলাই' নাটকে পাঠকের জিজ্ঞাসু মনের সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন।

'মানুষের অধিকারে' ওরফে 'দ্য শ্যাল নট ডাই' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নাটক ইতিহাসের নিরিখেই বর্ণিত হয়েছে। আলবামার স্কট সবরোতে এক বিখ্যাত মামলা এর ভিত্তি। মামলাটা হচ্ছে দুটি শ্বেতাঙ্গ স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় নয় জন কৃষ্ণাঙ্গ সদ্য যুবকের উপর। বলা যেতে পারে মামলাটি ছিল সাজানো। নাট্যকার এই ঘটনার আড়াল থেকে সোচ্চারে বলতে চেয়েছেন যে, মার্কিন সরকার বর্ণবিদ্বেষী। পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বোথা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী লেখালেখি শুরু হওয়ার সময়ে, বিশেষত কবি বেঞ্জামিন মালোয়জিকে জুলুম করে ফাঁসি দিয়ে মেরে ফেলার পরে বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ অ্যান্টি অ্যাপারথিড লেখকদের লেখায় এই নাটকটি পুনরুত্থিত হয়। প্রায় সমসময়েই মারাও যান অয়েক্সলে।

এই রূপ নাটকের সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রাত্য বসু তাঁর '১৭ই জুলাই' নাটকটির প্রেক্ষাপট গ্রহণ করেছেন। তিনি সাদা-কালো চামড়ার তীব্র বিদ্বেষ ঘৃণাকে ব্যবহার করেছেন হিন্দু-অহিন্দু বিদ্বেষর প্রতীকে। আলাবামার স্কট-সরবো হয়ে উঠেছে এ নাট্যের গুজরাটের 'পাঁচমহল' জেলার 'এরল' গ্রাম।

২০০২ সালের গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা, ১৯৯২ সালে ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস এবং নব্বই এর দশকের সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা বোধের উত্থান। ২০০২ সালে গুজরাটের নরেন্দ্রমোদী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গোধরার ঘটনার প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ার দাঙ্গায় দু হাজার মুসলমান খুন হয় এবং লাখখানেক মুসলিম উদবাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরের পরের সপ্তাহে ভারত বদলে গেল সম্ভবত

চিরকালের মতো। বরোদরা আর আমেদাবাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে হিংসা ছোটো খাটো শহরে আর গ্রামের বসতগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল। সরব কণ্ঠ জেলার গ্রামে গ্রামে উন্মত্ত জনতা ট্রাক্টর আর জিপে চেপে ঘুরতে লাগল। তাদের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের সম্পত্তি। বরোদরা আর আমেদাবাদের এই সাম্প্রতিকতম দাঙ্গা গুলোর বর্বরতা ছিল একেবারে অভূতপূর্ব। মুসলিম মহিলাদের ধর্ষণ করল। মুসলিম পুরুষদের মেরে তাদের লাশ নিয়ে বহ্নি উৎসব করল। প্রশাসন এই কাজে বিশেষ ভাবে সাহায্য করত। তরোয়াল আর বন্দুক থেকে শুরু করে পেট্রোল বোমা আর গ্যাস সিলিন্ডার পর্যন্ত নানা ধরনের অস্ত্র কাজে লাগাত তারা। এই দাঙ্গাবাজদের হাতে থাকত ভোটার তালিকা। তার সাহায্যে চিনতে পারা যেত কোণ বাড়ি গুলি মুসলিমদের, কোনগুলি মুসলিমদের নয়। অর্থাৎ তৎকালীন স্বাভাবিক চিত্র ছিল আরও বিস্তৃত ও ভয়ঙ্কর। এই প্ররিপ্রেক্ষিতে '১৭ই জুলাই' নাটকটি রচিত হয়েছে।

ব্রাত্য বসুর পিতা বিষ্ণু বসু একজন কমিউনিস্টধর্মী রাজনীতিবিদ্, লেখক, বুদ্ধিজীবী, তাই কম বয়স থেকে এক বামপন্থী শিক্ষা সংস্কৃতির মধ্যে বড় হয়েছেন। ব্রাত্য বসুর বড় হওয়ার মধ্য দিয়ে বহু সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা স্পষ্ট বোঝা যায় '১৭ই জুলাই' নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র চিত্রনের মধ্য দিয়ে। '১৭ই জুলাই' রাজনৈতিক তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণালব্ধ নাটক। উৎপল দত্তের 'মানুষের অধিকার' নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে '১৭ই জুলাই' নাটকে।বর্ণ বিদ্বেষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন যেন নাট্যকার। অর্থাৎ সমাজ যে কতটা নির্মম হতে পারে তাঁর এক অনন্য রূপ '১৭ই জুলাই' নাটকে প্রকাশ পেয়েছে।

'১৭ই জুলাই' নাটকে চরিত্র চিত্রণ,ভাবে ভাষায় সংলাপ ব্যবহারে ভারতবর্ষের রাজনীতি ধর্ম ও তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রকাশ পেয়েছে।

‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকটি রচনাকাল ২০০৭ সাল, এবং নাটকটির প্রথম প্রকাশ হয় ৮ই আগস্ট ২০০৮ সাল। ‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকটি মান তিন থেকে চার দিনের মধ্যে রচনা করেন ব্রাত্য বসু। যে কোনো সাহিত্যের নিবিড় পাঠে দেশ-কাল-সময়ের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তার আলাদা ধরণের মূল্যায়ন তৈরি হতে পারে। ব্রাত্য বসুর লেখা ‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকটিতে এক নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটে।

‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকটি নাট্যকার ব্রাত্য বসু এক নতুন দৃষ্টি ভঙ্গিতে রচনা করেন। ব্রাত্য বসু যখন কলেজে সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন সেই সময় নাট্যকারের এক বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ট সর্ম্পক হয়। ব্রাত্য বসুর নিজের আগ্রহে কোয়ান্টাম ফিজিক্স নিয়ে যখন পড়াশুনা করেছিলেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে, এমন কিছু কথা নীলস্ বোর ও হাইজেনবার্গ বলেছেন যা নাট্যকার ব্রাত্য বসুর মনের ভিতর এক নতুন ভাবনার প্রকাশ ঘটে। হাইজেনবার্গের ‘কোয়ান্টাম’ সূত্র আবিষ্কার, ডিরাগ ও শ্রয়েডিংগার লেখার অনুভূতি যেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু পেয়েছিলেন। এবং নাট্যকার ব্রাত্য বসু দেখেছিলেন কোয়ান্টাম ফিজিক্স যদি নাটকের মধ্যে প্রয়োগ করতে পারেন, তাহলে আমাদের বেঁচে থাকার অনিশ্চয়তার সঙ্গে যদি মৌলিক কণা গুলোকে যুক্ত করতে পারেন, পদার্থবিদ্যার সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নাট্যকার ব্রাত্য বসু ‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকটি রচনা করেন।

‘কৃষ্ণগহ্বর’ নাটকে চুয়ান্নবছর বয়সের চিত্রশিল্পী অংশুমান কয়েক মাস ধরে হোমোসেক্সচুয়েল হয়ে উঠেছেন। অংশুমানের স্ত্রী জয়তী কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপিক। ছেলে অভিষেক সবে এম.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছে। আর মেয়ে মৌ পাসকোর্সে পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে কম্পিউটার শিক্ষারত, এবং সে একজন নাট্যকার্মী। শিল্পী হিসেবে অংশুমান বেশি নাম করতে পারেননি।সামান্য অবসাদে ভুগতেন, তাই একাকীত্ব ছিল তার নিবিড় সঙ্গী। স্ত্রীর ছাত্র রাহুলের

প্রতি তিনি আকর্ষন বোধ করতেন। শারীরিক সম্পর্ক ও তৈরি হয় তাদের মধ্যে। অংশুমানের স্ত্রী জয়তীর সঙ্গে সহকর্মী রঙ্গনের একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। পুত্র অভিষেকের প্রেমিকা অনিন্দিতা একটা অস্থিরতায় ভোগে। দেবরাজ এর সঙ্গে তার মায়ের পুনর্বিবাহের সম্ভাবনা তাকে অসহায় করে তুলে। অনিশ্চিত ভবিষ্যত ভেবে সংশয় বোধ করে অনিন্দিতা। অংশুমান ও জয়তীর মেয়ে মৌ এর প্রসঙ্গ গ্রুপ থিয়েটারের অন্তর্গত সংঘাত, রাজনীতি ঢুকে পড়ে 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকে। রাহুল অংশুমানকে ছেড়ে গেলে সে ক্রমশ অবসাদের চুড়ান্ত পরিণতি আত্মহননের দিকে এগিয়ে যায়। অংশুমান আশৈশব প্রেম আর সৌন্দর্যে বিশ্বাস করেছে আর সেগুলো সারাজীবন ধরে তার হাতের কাছাকাছি এসেও চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত অংশুমান, রাহুল, জয়তী, অনিন্দিতা, মৌ, দেবরাজের চরিত্রের টানাপোড়নে নাটক পৌঁছে যায় জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে।

'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র ড. জয়ন্ত ঘোষ একদম শেষে গিয়ে জীবনরহস্যের উন্মোচনে অপারগ হয়ে বলে ওঠেন 'বিষয়টি অনিশ্চিত' কিন্তু মনে রাখতে হবে এ নাটকের প্রধানতম চরিত্র অংশুমান এই অনিশ্চিয়তা তত্ত্বের বিরোধিতা করতে চায়। সে তার আত্মহননের মধ্য দিয়ে তার যে প্রতিপাদ্য খাড়া করতে চায়, সে সমস্ত অনিশ্চয়তার বোধ, জীবনে প্রতিমুহূর্তে তৈরি হয়ে চলা কৃষ্ণগহ্বরের উপস্থিতি, বেদনা-শঙ্কা-আনন্দ-বিপন্নতাময় এই পৃথিবীর মধ্যে আমাদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপস্থিতি ও তার মোকাবিলা করতে চাওয়া অতি মানবিক কিছু মুহূর্ত-এ সবই আসলে জীবনের একদম প্রথমে হয়তো কোনো দেব আমাদের কুঞ্চিত কপালে খোদাই করে দিয়েছেন। অংশুমান বিশ্বাস করে তার জীবনে নাগাড়ে ঘটে চলা এই বিপর্যয়, এমনকি তার সমস্ত সিদ্ধান্ত কোনো 'হামারশিয়া'র মতো তার চরিত্রের সমস্ত ধাতুতে মজ্জায় সংলগ্ন হয়ে থাকলেও, এই সিদ্ধান্তের বোধ, তার ফলাফল, বিষাদ, কোনো তুচ্ছ অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হওয়া ও হৃদপিন্ডের দপদপ করে ওঠা এবং এক অনতিক্রম্য বিষাদে

আচ্ছন্ন হয়ে পড়া এ সব যেন আগে থেকে ঠিক করা। এ সবই নেমেসিস দেবী তার গোপন হাতচিঠিতে আমাদের জীবনের একেবারে গোড়ায় জানিয়ে দিয়েছেন ।

অংশুমানের মনের ভিতর বাসা বেঁধে ছিল অসংখ্য কৃষ্ণগহ্বর। কারণ শিল্পী হিসেব অংশুমানের পরিচিত না পাওয়ার কারণে তার ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। অংশুমানের স্ত্রীর ছাত্র রাহুলের চোখ, হাসি, সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ সবকিছু স্মরণ করিয়ে দিত যুবক অংশুমানের স্মৃতিকে।অংশুমান জীবন সম্পর্কে, শিল্প সম্পর্কে ক্রমশ উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। অংশুমান ভালোবাসা আন্তরিকতা, আর নৈপুণ্য দিয়ে ছবি আঁকত। নাট্যকার ব্রাত্য বসু 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকে সমকালীন মানুষ তাদের ছোটোখাটো সুখ-দুখ, যন্ত্রণা সামান্য খুশি আর পারা না পারার সঙ্গে চরিত্র গুলি মিলিয়ে নিতে পারে।

ড. জয়ন্ত ঘোষ চিকিৎসক কিন্তু নিরেপেক্ষ বজায় না রেখে তার ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির উষ্ণতা সঞ্চারিত হয়ে যায় রোগীদের মধ্যে। রোগীর কাছে প্রাক্তন স্ত্রীর উল্লেখ করে। সেও অংশুমানের খোঁজ করে ফোনে, অংশুমান শেষ চিঠিটা জয়ন্ত ঘোষকে লেখা। ডাক্তার আর রোগীর সম্পর্কের বাঁধা ধরা গতের বাইরে সম্পর্কে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। গড়ে উঠে এক ভালো বন্ধুত্ব, তবে তাদের মধ্যে আদর্শগত বিরোধ আছে। এই বিরোধ বিজ্ঞান আর ট্রাজেডি, প্রেমহীনতা আর প্রেম, নিউটনীয় বলবিদ্যা বনাম কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিরোধ। অভিষেক 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকে উত্তরপুরুষের প্রতিনিধি। সংসারে যে সমস্যাই হোক না কেন সব বিষয়ে নিরুদবেগ থাকা তার স্বভাব। প্রেমিকা অনিন্দিতার পারিবারিক অস্থিরতার কারণে প্রেমিকার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অংশুমান। অংশুমানের সমকামিতার স্বভাবের আবিষ্কারে উত্তেজিত, অসহায় জয়তীকে শান্তভাবে সামলেছে অভিষেক। অংশুমানের স্ত্রী জয়তীর সহকর্মী রঙ্গন জয়তীকে ভালোবাসে। রঙ্গন সুপণ্ডিত কিন্তু তাত্ত্বিকতার বেড়া জালে আবদ্ধ। তাত্ত্বিকতার শুকনো

খোলসের অন্তরালে তার মানবিকতা বারবার প্রকাশিত।জয়তীর কন্যা মৌ অভিনয় করে। সেই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক খেলার চিত্র শিল্পের জগতে যে খণ্ডচিত্র সৃষ্টি করে তার রূপ স্পষ্ট বোঝা যায়।

২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু। 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকে নন্দীগ্রামের উল্লেখ রয়েছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গে নন্দীগ্রামের যে যোগাযোগ সেই কারণে 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকের অলোক চরিত্রটি আসে নন্দীগ্রাম থেকে। সে এসে তার সমস্যার কথা বলে এবং তাকে কেন্দ্র করে গৌরি ও প্রজিত গিয়ে একটা 'কৃষ্ণগহ্বর' এর মধ্যে পড়ে। 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকের প্রত্যেক চরিত্র অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ভোগে। এমনকি থিয়েটারকে আশঙ্কা ও থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় প্রজিতকে আড়ষ্ট করে রাখে।

গণনাট্য থেকে নবনাট্য ও গ্রুপ থিয়েটার পর্যন্ত যে বাংলা নাটকের ভিত্তি ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক ভাবধারা, প্রত্যক্ষ সরাসরি বিরোধিতা করা। তা ক্রমশ থমকে গেল ত্রিশ বছরের বামপন্থী সরকারি সংলগ্নতায়। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পত্তনের পর বাংলা নাটক বিদেশি নাটকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু নাট্যকার ব্রাত্য বসুর লেখনী ক্ষমতার স্পর্শে মানুষ আবার বাংলা নাটকে মনোনিবেশ করল। 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকের অংশুমান–রাহুলের জটিলতর সমকামী আকর্ষণ-বিকর্ষণ, জয়তী-রঙ্গনের সাবলীল পরকিয়ার পাশে সংগ্রামী নাট্যগোষ্ঠীর অনিশ্চিত শিল্প চর্চার রূপের আলোকে স্পর্শ করে সমকালীন দুঃসময় কে। অর্থাৎ 'কৃষ্ণগহ্বর' নাটকটিতে একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় নাটকটির চরিত্র-চিত্রন ও কাহিনী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে।

২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রাত্য বসু 'ভয়' নাটকের খসড়া তৈরি করেন। আবার সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় 'ভয়' নাটকটি লেখেন 'পূর্ব পশ্চিম' নাট্যপত্রের জন্য। 'ভয়' নাটকটি মূলত ভূতের

নাটক হলেও, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি উত্থান পতনের অবস্থা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন নাট্যকার ব্রাত্য বসু।

উপসংহার

নাটক সাংস্কৃতিক জীবনে এক বড় স্থান দখল করে আছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। আমাদের জীবনের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের হাসি-কান্না, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রেরণা, ক্ষোভ সবকিছু প্রতিফলন ঘটে নাটকের মঞ্চে। জীবন থেকে কুড়িয়ে নেওয়া গল্পগুলো অভিনয়শৈলীর মাধ্যমে দর্শকদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া মঞ্চ নাটকের মূল উদ্দেশ্য। নাটক জীবনের কথা বলে সামাজিক অনাচার, অবিচার, শোষন, বঞ্চনা ও কুসংস্কার নিয়ে তৈরি নাটক আমাদের সমাজকে সব সময়ই নাড়া দিয়েছে পরিবর্তন এনেছে সমাজ মননে।

জীবনের প্রতিটা কাজের পেছনে একটা লক্ষ্য থাকে। সেই অর্থে মঞ্চ নাটকেরও একটা লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে। সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার বলা হয় মঞ্চ নাটককে। সমাজ পরিবর্তনের সাথে আর যে বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা হচ্ছে রাজনীতি কিন্তু এই সমাজ পরিবর্তনের ধারক হয়ে ওঠা একদিনে হয়নি। সেই ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য নতুন অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল তৎকালীন সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, চলচিত্র এবং সর্বোপরি নাটকে কিন্তু সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের ধারা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি এর প্রধান কারন নাটকে রাজনীতির প্রভাব। যে নাটক স্বপ্ন দেখিয়েছিল শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন এক সমাজের। কিন্তু ধীরে ধীরে পর্যবসিত হতে থাকে পার্টির প্রোপোগাণ্ডা থিয়েটারে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যেমন পৃথিবী ব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ঠিক তেমনিভাবে রাজনৈতিক নাটক গুলিও এক বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল সমাজের মধ্যে।

বাংলা নাটকে রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত ‘নীলদর্পন’ নাটকে।পরবর্তীকালে চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলন বাংলার

নাট্যসমাজকে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। বিংশ শতকে শেষের দশকে এসে বাংলা নাট্যসমাজে এক নতুন রূপ প্রকাশ পেল নাট্যকার ব্রাত্য বসুর হাত ধরে। রাজনৈতিক নাটক এক অনন্য রূপ লাভকরে সমাজের ক্ষেত্রে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের নানা ভূমিকায় নানা রূপে নাট্যকার ব্রাত্য বসু তাঁর নাটক গুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন ও সফল হয়েছেন। অধ্যাপক, নাট্য প্রযোজক, পরিচালক, নাট্যকার হিসেবে ব্রাত্য বসু বাংলা নাট্যজগতে এক অনন্য রূপ লাভ করেছে।

নাটক এবং রাজনীতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও অধিকার আদায়ের ভিন্ন দুটি মাধ্যম। নাটক কখনো কখনো প্রচার করতে চায় রাজনৈতিক আদর্শ। রাজনীতি যেমন মানুষকে মানুষের খুব কাছে নিয়ে যায়, চিনতে শেখায়, অধিকার সচেতন করে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথের দিশা দেখায় ঠিক ভুল বোঝার মঞ্চ তৈরি করে দেয়, তেমনি নাটক মানুষের সঙ্গে সরাসরি রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহ্যের সংগ্রামের যোগাযোগ স্থাপন করে। নাট্যকার ব্রাত্য বসুর রাজনৈতিক ধর্মী নাটক গুলি মানুষের মধ্যে এক সচেতন দৃষ্টি প্রকাশ করে। কারন রাজনীতি হল একটা লড়াই, প্রতিকূল একটা শক্তির বিরূদ্ধে পরাভূত করা তার লক্ষ্য। রাজনীতি হল একটি বিজ্ঞান, যার একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে, পদ্ধতি আছে। ব্রাত্য বসুর নাটকের মধ্যে রাজনীতি দিক এক ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। বাংলা নাট্য জগতে এর আগে এরূপ অসমসাহসীকতা নিয়ে কেউ নাটক রচনা করেননি।

নাট্যকার ব্রাত্য বসুর নাটকে ভারতবর্ষের সমাজ, রাজনীতির পাশাপাশি উঠে এসেছে বিশ্ব রাজনীতি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সাধারণ মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়নের রাজনীতিও লক্ষ্য করা যায় ব্রাত্য বসুর নাটকে। এছাড়াও ব্রাত্য বসুর নাটকে শ্রেণীচেতনা, ইতিহাসচেতনা, সমাজচেতনা, শিল্পগুণ বিশেষ ভাবে প্রভাব সৃষ্টি করেছে।

নাট্য আঙ্গিকের গুরুত্বকে ব্রাত্য বসু কখনও অবহেলা করেননি। এবং ব্রাত্য বসুর নাটকের একটি বিশেষ গুণ হল ভাষা। ভাষা ব্যবহারের মধ্যে নাট্য শৈল্পিক গুণ বিশেষ ভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে নবীনতম নাট্যকারদের মধ্যে অন্যতম হলেন ব্রাত্য বসু। রাজনৈতিক মতাদর্শের পাশাপাশি নাটক রচনায় ও অভিনয়ে ব্রাত্য বসুর হাত যে সিদ্ধহস্ত তা নাটকগুলি তাঁর পরিচয় প্রদান করে। রাজনৈতিক ফ্যান্টাসি, প্রকৃতি মানুষের সম্পর্ক, সংগীত ও জীবনের বন্ধন, মূল্যবোধহীনতা, বিপ্লব আর প্রেমের দ্বন্দ্ব, সময় ও সভ্যতা ইত্যাদি নানা বিষয়ে রচিত ব্রাত্য বসুর একের পর এক নাটক যেমন মঞ্চ সাফল্য পেয়েছে,তেমনই গভীর ভাবে দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছে মানুষের মনে।মানুষের জীবনে আকণ্ঠ যন্ত্রণা ও আনন্দ,আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-আবিষ্কার, প্রয়োজনের আঘাতে প্রায়শই প্রতিহত হয়। মানুষ বা সমাজের নানান সমস্যার পটভূমিকা নাটক গুলিতে বিশেষ ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে।

ব্রাত্য বসুর বেশিরভাগ নাটক গুলিতে দেখা মিলেছে এক সমাজ নির্ভর বাস্তব চিত্র। প্রতিটি নাটকে আলাদা আলাদা বিষয়বস্তু নিয়ে গড়ে ওঠে।রাজনীতি, অবক্ষয়ী সমাজ ,ব্যাক্তি অর্থাৎ সমগ্র জীবনের টুকরো টুকরো প্রতিফলনের অবিমিশ্র ছবি থাকে ব্রাত্য বসুর নাটকে। তাঁর লেখায় অবচেতনা, চেতনা, ব্যক্তির সংকট, সব মিলিমিশে যাবে। ব্রাত্য বসুর লেখায় শব্দের খাঁজে খাঁজে তৈরি হয় ছোটো ভাবের প্রকাশতা, ও এক নিটোল ভাস্কর্য। নাট্যচেতন বিকাশ ও নাট্যধারার মধ্যে বিবর্তনের রূপের যে এক স্পষ্ট রূপ পাওয়া গিয়েছে দীর্ঘ সময় পর তা নাট্য প্রেমিদের মধ্যে নতুন ভাবনার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এক পুরনো যুগের চলন চিত্রের রূপের যে পরিবর্তন ব্রাত্য বসুর কলমে নতুন, নতুন রূপে ভিন্ন দৃষ্টিতে প্রকাশ পেয়েছে।

নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক ব্রাত্য বসু আধুনিক বাংলা নাট্যজগতে এক প্রতিভাবান নাট্যকার হিসেবে রূপ লাভ করেছেন। সমাজের বহমান জীবন থেকে নাটককার তুলে নেন

তাঁর নাটকের বিষয়। ব্যক্তিগত, যন্ত্রণা, অভিমান থেকে উঠে আসে আত্মপরিচয়ের ভাষা। নাটকের চরিত্র-চিত্রন, ভাবে ভাষায় এক অনন্য রূপ ফুটে উঠে নাটকে।

গ্রন্থপঞ্জি

১। ব্রাত্য বসু, নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯।

২। ব্রাত্য বসু, নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, মে ২০১০, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯।

৩। ব্রাত্য বসু, নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কোলকাতা ৭০০০০৯।

৪। শোভন গুপ্ত, ‘এবং ব্রাত্য’, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, জানুয়ারি ২০১৫।

৫। শম্পা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসুর নাটক থেকে নাট্যে, দীপ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০১৫।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা নাট্যশোধ থেকে সংগৃহীত

১। মৈনাক বন্দোপাধ্যায়, ব্রাত্যর নাট্যজীবন, প্রকাশকাল ২০১৭, অসময়ের নাট্যভাবনা;

২। সম্রাট মুখোপাধ্যায়, এবার থিয়েটার কোম্পানী, প্রকাশকাল ২০১৬, আজকাল পত্রিকা;

৩। দীপেন্দু চক্রবর্তী, নবীন নাট্যকারের অভিযান, প্রকাশকাল ২০০৬,

দেশ ৭৩ বর্ষ ১৯তম সংখ্যা;

৪। সোমা বন্দোপাধ্যায়, 'অনুবাদে ব্রাত্য, প্রকাশকাল ২১শে জানুয়ারি ২০০৬, আজকাল পত্রিকা;

৫। অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ব্রাত্যর খোঁজে, আজকাল পত্রিকা, ৩রা ডিসেম্বর ২০১১;

৬। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মৌলিক বিষয়বস্তুতে ভরা নাটক, দেশ পত্রিকা ৩০শে মে ১৯৯৮,

৬৫ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, আনন্দবাজার পত্রিকা;

৭। অমৃতাভ বন্দোপাধ্যায়, একটি রাজনৈতিক ফ্যান্টাসি, ২রা মে ২০০২, আনন্দবাজার পত্রিকা;

৮। মনসিজ মজুমদার, অবক্ষয়ী মনুষ্যত্বের সংকট, ১৮ই অক্টোবর ২০০৩, আনন্দবাজার

পত্রিকা;

৯। শিবাশিস বন্দোপাধ্যায়, একটি উগ্ররাজনৈতিক পালা, ১৫ই আগস্ট ২০০৪, সানন্দা

পত্রিকা;

১০। গৌতম ঘোষদস্তিদার ,নন্দীগ্রাম প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকে নাটকের কেন্দ্রে, ১৪ই ডিসেম্বর ২০০৭,

সংবাদ প্রতিদিন পত্রিকা;

১১। শেখর সমাদ্দার, চতুষ্কোণ, ব্রাত্য বসু ও একটি জার্নি, ২০১৭, অসময়ের নাট্যভাবনা;

১২। সুমন চট্টোপাধ্যায়, ২০০২ নয়, ১৯৭৭ টাই ছিল ভুলে ভরা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০০২;